বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২৪ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সহস্র বর্ষের শ্রেষ্ঠ নাম

শেখ মুজিব

আনিসা চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি, ম্যাপল লিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

সাফিয়া নূর ঈদি, তৃতীয় শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

সম্পাদকীয়

এসে গেল অগ্নিঝরা মার্চ মাস। মার্চ মাস আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই মার্চ মাসেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এখন বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ, বিশ্বের সম্পদ। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরপরই এ দেশের মুক্তিকামী মানুষ মরনপণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে ১৯৭১- এর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। আমরা পেয়ে যাই লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

বন্ধুরা তোমরা তো জানো, মার্চ মাসের ১৭ তারিখ জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ তিনি গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ১৭ই মার্চ থেকে সরকারিভাবে তাঁর জন্মদিনকেই বেছে নেওয়া হয়েছে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে। কারণ তিনি শিশুদেরকে খুব ভালোবাসতেন। এই শিশু দিবসে সকল শিশুর প্রতি রইল আন্তরিক ভালোবাসা।

ছোটোবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু চঞ্চল আর দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল। ন্যায়ের স্বপক্ষে মাথা উঁচু করে কথা বলেছেন। তিনি ছিলেন মুক্তিকামী। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার শৈশবকাল থেকেই তাঁর মনকে বড়ো বেশি পীড়া দিত। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন প্রচণ্ড দেশপ্রেমিক। তাঁর দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। তাই তিনি বিশ্ব বরেণ্য মহান নেতা। বন্ধুরা, তোমরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যত বেশি পড়বে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তত বেশি জানতে পারবে।

মনে আছে কী, ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর কথা? ২৫শে মার্চের কালরাতে বাঙালিদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো পাকিস্তানি শাসকেরা বন্দি করে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বন্দি হওয়ার আগেই বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই ২৬শে মার্চকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে পালন করি আমরা। এই দিনে আমরা পরম শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অংশগ্রহণকারী দেশের জনগণ এবং ত্রিশ লাখ শহিদকে।

স্বাধীনতার এই শুভক্ষণে ভালো থেকো বন্ধুরা। তোমাদের জন্য রইল অফুরন্ত ভালোবাসা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

সূচি

নিবন্ধ

৩ সহস্র বর্ষের শ্রেষ্ঠ নাম শেখ মুজিব/ জাফর ওয়াজেদ
২৬ জয় বাংলা/ আমীরুল ইসলাম
৩৩ বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই শিশু অধিকার আইন/ মাহবুব রেজা
৫৪ ধন্য কিশোর/ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী
৫৮ ঐতিহাসিক উদ্যান/ মো. কবির হোসেন
৬৩ মানতে হবে যেসব আইন/ কামরুন নাহার কনা

গল্প

৮ কলাপাতা ও লাল জবাফুল/ ইমদাদুল হক মিলন
১৯ মুক্তিযুদ্ধের বাড়ি/ ফরিদুর রেজা সাগর
২৩ অটোগ্রাফের খাতা/ আহসান হাবীব
৩৭ ভোলা এবং টুকুন সোনা/ নাসরীন মুস্তাফা
৪৪ মুক্তিযোদ্ধা গাছভাই/ আশিক মুস্তাফা
৪৭ বাবার যুদ্ধ/ তৌহিদ-উল ইসলাম
৫১ মুক্তিযোদ্ধা গাছের গল্প/ তারিকুল ইসলাম সুমন

কবিতাগুচ্ছ

০৭ শেলী সেলিনা
১৭ বর্ণালী সান্যাল/ খোরশেদ আলম নয়ন
১৮ আবদুল লতিফ/ নূর আলম গন্ধী
৩২ মিয়াজান কবীর
৪৩ তানিয়া তানি
৫৬ নুসরাত জাহান/খায়রুল আলম রাজু
৫৭ মিশকাত উজ্জ্বল/ পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

সাফল্য প্রতিবেদন

৬৫ বঙ্গবন্ধু অ্যাপ/ সানজানা শরীফ
৬৬ অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা/ আনোয়ার হোসেন
৬৭ আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জয়
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬৮ নৌযান প্রযুক্তি আবিষ্কার/ মেজবাউল হক
৬৯ নারী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ/ মো. ফারুক হোসেন
৭০ অভিনয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/ জান্নাতে রোজী
৭১ অ্যাপ বানাল শিশু রাইশা/ শাহানা আফরোজ
৭১ রোমান যুগের ডিম/ সানজিদা আহমেদ
৭২ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর খাবার/ মো. জামাল উদ্দিন
৭৩ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৭৫ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

ছোটোদের লেখা

৬০ কেমন করে পেলাম/সাবাহ্ নূর তৌফিকা

ছোটোদের ছড়া

৬২ সাবিকুন নাহার প্রীতি/মাহফুজ আনাম
লাবিবা তাবাসসুম রাইসা/মেশকাউল জান্নাত বীথি

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আনিসা চৌধুরী/ সাফিয়া নূর ঈদি
৬১ নাফিসা তাসনিম স্নেহা
৭৬ ইসরাক হাসান আদৃক
৭৭ আফনান সাদ জামান/ তাছনিম আক্তার শিফা
৭৮ সামিকা নূর ইমি/ ফারিন খান
৭৯ মারিয়াম হোসাইন/রহমাতুল আলম
৮০ আরিকা আজিজ/কায়নাত মারিয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

সহস্র বর্ষের শ্রেষ্ঠ নাম শেখ মুজিব

জাফর ওয়াজেদ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ চৈত্রদিনের গান, বসন্তকালের আলো-হাওয়া প্রবাহিত তখন, আর এরই মাঝে আবির্ভূত হলেন বাংলার সহস্র বর্ষের সাধনার নাম- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শুধু একটি নাম নন, হলেন একটি জাগ্রত ইতিহাস।

একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাথা। বাংলাদেশের অস্তিত্বস্পর্শী অমর নাম। ন্যায়, সত্য, কল্যাণ এবং আত্মমুক্তির পক্ষে সোচ্চার উদার হৃদয় মহান মানুষ। কোনো প্রকার সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনো। বাঙালিত্ব ছিল তাঁর অহংকার। এই বাঙালিকে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতায়। কোটি কোটি মানুষের ইচ্ছার অনিন্দ্য কুসুম ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁরই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধজয়ের রক্তাক্ত অধ্যায়ে বাঙালি জাতি। সৃষ্টি করেছিল ইতিহাস। জাতির শাণিত শিরায় অকুতোভয় সাহস ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃসময়, হতাশার সব বাধার দেওয়াল ভেঙে দীর্ঘ পরাজিত, শোষিত, বঞ্চিত জাতিকে স্বাধীনতার সূর্যস্নানে স্নাত করিয়েছেন। তাই তো প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উচ্চারিত হয় ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় সিক্ত একটি নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই নাম অবিরাম প্রতি সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে অক্ষয়-অম্লান। চিরদিন বাংলার আকাশে-বাতাসে-মাটিতে শৌর্যে-বীর্যে বহমান নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের প্রিয় নাম হয়ে প্রজ্বলিত যুগ থেকে যুগে। বঙ্গবন্ধু তো শুধু একটি নাম নন, তিনি হলেন একটি জাতির জাগ্রত ইতিহাস। একটি জাতির জন্মদাতা। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার অপরিমেয় অহংকার, বর্ণিল ঐশ্বর্য। বঙ্গবন্ধু, বাঙালি এবং স্বাধীনতা একসূত্রে গাথা।

বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। অসমাপ্ত সেই জীবনী। ঘাতকের উদ্যত সঙ্গিন সেই রচনা সমাপ্ত হতে দেয়নি। একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দেশি-বিদেশি এজেন্টরা বাঙালিত্বের চেতনা এবং স্বাধীনতার সব অর্জনকে নস্যাৎ করে দিতে বঙ্গবন্ধুর ওপর আঘাত হানে। যে শালপ্রাংশু, সিংহহৃদয় মহান মানুষটি অসীম দেশপ্রেম, জনগণের

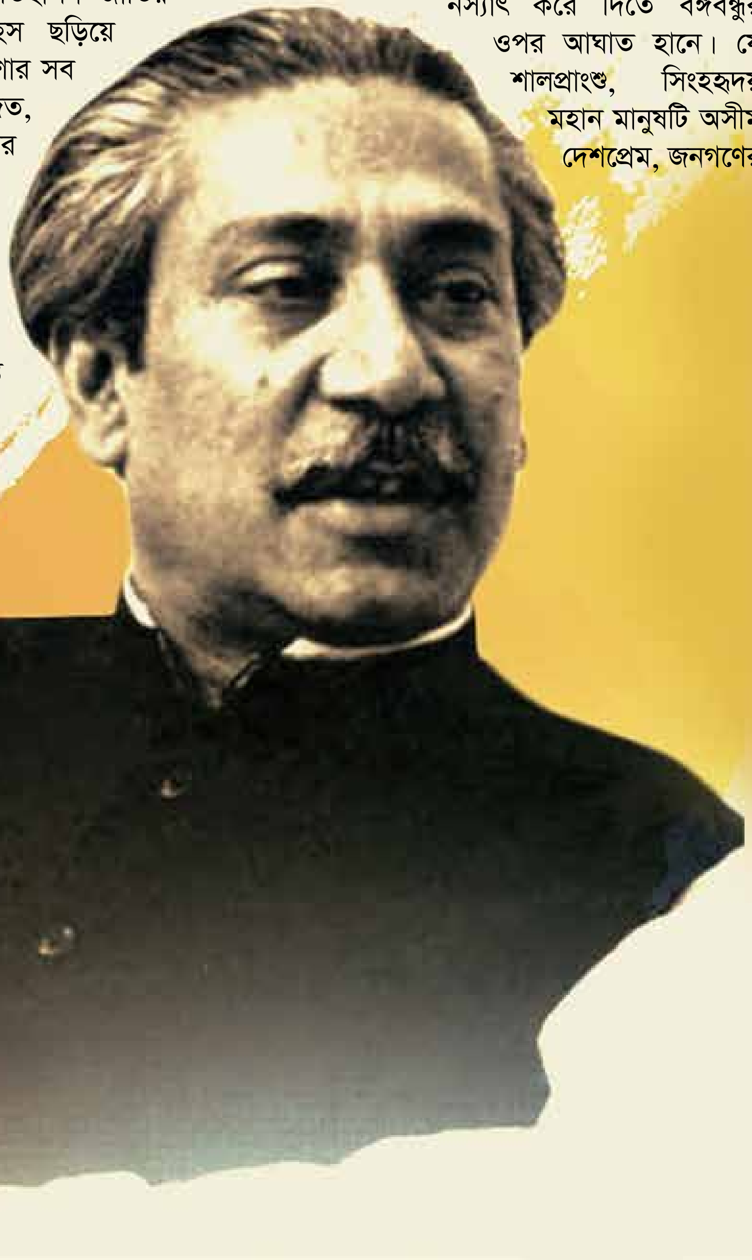

প্রতি তর্কাতীত ভালোবাসা, অনমনীয় দৃঢ়তা, ভয়-দ্বিধাহীন প্রত্যয় এবং কঠোর অধ্যবসায়কে সম্বল করে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়েছেন। শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা এবং সর্বোপরি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট দস্যুর মতো রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র অবস্থায় পরিজনসহ হত্যা করা হয়েছিল। এ যে জাতির জন্য কত বড়ো গ্লানি, অপমান ও লজ্জার কথা; তা অবর্ণনীয়। ইতিহাসের চাকা, সভ্যতার চাকাকে নিষ্পেষিত করে ঘাতকরা বাঙালি জাতির জীবনে সৃষ্টি করেছিল ট্র্যাজেডি।

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম যে মহান মানুষটির, তাঁর জীবন ও কর্ম একটি জাতির জীবনকে দিকনির্দেশনা দেয় প্রতিমুহূর্তে। মানুষের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ শেখ মুজিবকে এক মহানপ্রাণ মহামানবে পরিণত করার দিগন্ত উন্মীলিত করেছে। বাঙালি জাতির প্রাণপ্রবাহ এবং ধমনিতে তিনি সাহসের মন্ত্র বুনে দিয়েছেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তিনি। বাংলার অবহেলিত এবং হতভাগ্য জনগণের কল্যাণ কামনায় সর্বক্ষণ ব্যাপৃত ছিলেন। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে তাঁর অত্যন্ত ব্যস্ততায়। একটি মুহূর্তকেও অপচয় খাতে প্রবাহিত করেননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ একটি নাম, একটি ইতিহাস। বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনধারার প্রতিটি সিঁড়িতে ছিলেন তিনি এককভাবে অগ্রসরমান। সবাইকে পেছনে রেখে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন একটি পশ্চাৎপদ ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার কঠিন কাজটি সম্পাদনে। একটি জাতির জাগরণ, একটি জাতির অভ্যুত্থান, একটি রক্তাক্ত একাত্তর এবং একটি স্বাধীনতা- সবকিছুই সম্ভব হয়েছে একক নেতৃত্বে। আর এই যুগান্তকারী কালজয়ী নেতাই হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালি যাকে 'বঙ্গবন্ধু' খেতাব দিয়ে সম্মানিত-সমৃদ্ধ করেছে নিজেদের। জাতি জানে, এসব অর্জন সম্ভব হয়েছিল একজন শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে। ছিলেন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, আপোশহীন। সততা, কর্মনিষ্ঠতা, কর্মকুশলতা সবকিছু মিলিয়ে এক অতুলনীয় মানবে পরিণত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি জাতির জীবনে আপন দ্যুতিতে প্রজ্বল এক অবিনাশী ধ্রুবতারা। সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতি পেয়েছে তার মহানায়ককে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে।

শেখ মুজিবুর রহমানের পুরো জীবনটাই নিবেদিত তাঁর দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে জাতির প্রতি যে অপরিসীম ভালোবাসা, তা প্রমাণ করে গেছেন। জীবনের পুরো পথ পরিক্রমায় বাঙালির সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার ছিলেন। নিরন্ন, দুঃখী, অভাবী, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত জাতির দুর্ভোগ মোচনে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে অগ্রসেনানীর দায়িত্ব পালন করেছেন। দাঙ্গাপীড়িত বাঙালি-অবাঙালিকে রক্ষায় জীবন বাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন। লোভ-মোহের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই শাসকের নানা প্রলোভন উপেক্ষা করে দুঃসাহসে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী হয়েছেন। দিনের পর দিন কেটেছে কারাগারে। লৌহকপাটের অন্তরালে কখনো ভেঙে পড়েননি। হতাশা গ্রাস করেনি। শাসকদের সমঝোতার পথকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভোগ, বিলাস, ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করে বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আপোশহীনভাবে লড়াই করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সগর্বে ঘোষণা করেছেন, 'দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সেই সাহসী উচ্চারণ অহেতুক ছিল না। প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখা সহজসাধ্য নয়। এই ঘুমন্ত জাতিটিকে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছেন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে। যে জাতি কখনো বন্দুক-বেয়নেট দেখেনি, সে জাতি একাত্তরে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছে বাঁশের লাঠি, লগি-বৈঠা ফেলে। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' হিসেবে জেনেছেন তিনি। ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহের উত্তাপ বঙ্গবন্ধু ধারণ করতেন। তাই জাতিকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। হাজার বছর ধরে পরাধীন-পর্যুদস্ত থেকে থেকে যে জাতিটি আধমরা থেকে পুরো মরায় পরিণত হচ্ছিল ক্রমশ; বজ্রহুংকারে শুধু নয়, আদরে-সোহাগে প্রাণের প্রবাহে স্পন্দন তুলে একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি। জীবনের পুরো সময়ই থেকেছেন আন্দোলন, সংগ্রামে। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার। দেশ স্বাধীন করার। দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। লাল-সবুজের পতাকায় বাঙালির মুক্তির জয়গান লিখেছেন। তাঁর জীবন এক বীরত্বগাথা।

শুধু বাঙালি জাতি নয়, বাংলা ভাষীসহ অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছেও মুক্তির প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গার সময় ছুটে গিয়েছেন কোনো পক্ষাবলম্বন না করেই। দুপক্ষকেই নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। অবাঙালিদের বলেছিলেন, তোমরা আমার ভাই। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, আমার দেশের মানুষের রক্তে হোলিখেলার চেষ্টা করো না। দেশে বসবাসরত বাংলা ভাষী নয়, এমন মানুষকেও তিনি কাছে টেনেছেন। বলেছেন, সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে সবাই যেন যার যার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এক হয়ে মিশি। ভুলে যাই যেন ভেদাভেদ। নিজের জীবনেও তিনি এই বিশ্বাসবোধের প্রমাণ রেখেছেন। উর্দু ভাষীদের তিনি ঘৃণার চোখে কখনো দেখেননি। বরং তাদেরও বাঙালিদের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পৃথিবীর নিপীড়িত জাতিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘে বক্তৃতাও করেছিলেন এবং তা বাংলা ভাষায়। বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন উচ্চাসন।

বঙ্গবন্ধু স্কুলজীবন থেকেই স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠেছেন বলেই জন্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় লালিত ছিলেন তিনি। কারাগারের জীবনে এবং পাকিস্তানি কারাগারে একাত্তরের ৯ মাস বন্দিজীবনকালে নিয়মিত কোরান তেলাওয়াত করতেন। কিন্তু কখনই ধর্মান্ধ ছিলেন না।

তাই ইংরেজি ভাষা ছাত্রজীবনেই চর্চা করেছেন। এ ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বলেই এবং মেধাবী হিসেবে সেসময়ের কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন। আইন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা চলাকালেই বহিষ্কৃত হন। তাঁর অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন দান।

বঙ্গবন্ধু বুঝতেন, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর বসবাস সম্ভব নয়। জোড়াতালি দিলেও মেলানো যাবে না। সুতরাং, ছয় দফা দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু এক দফা ঘোষণা করলেন এবং তা স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। সারাদেশ গর্জে উঠল সেই ডাকে। পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশ। বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি। উঠে এল 'বাংলাদেশ'নামক একটি নতুন রাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে পুরো জাতি যে একটি বিন্দুতে এসে স্থির-প্রত্যয়ী হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্বাধীনতা। পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকারের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবিতে পৌঁছে গেছে ততদিনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। পশ্চিমা সংবাদপত্রে বলা হলো 'ভয়েস অব বেঙ্গল'। সত্যিকার অর্থেই বঙ্গবন্ধু তখন বাংলার কণ্ঠস্বর। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে তাঁর স্বাধীনতার জন্য করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিলেন। এমন পূর্বাভাসও দিলেন, 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তবে তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাঙালি নীরবে আক্রমণ মেনে নেয়নি। বঙ্গবন্ধু 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে'তোলার জন্য বলেছিলেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেই ঘোষণা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। সারা বাংলার মানুষ প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। গণহত্যার বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাঙালি অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল শেখ মুজিবের ডাকে। গড়ে উঠল স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার। যুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। কিন্তু বাংলার জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর নামে। বঙ্গবন্ধুর প্রভাব এমন সর্বব্যাপী ছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোশ করার চেষ্টা যারা করেছিল, তারাও বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করেছিল।

তিনি দেশ, জাতি ও জনগণের প্রতি ছিলেন সৎ। তাঁর সততা ছিল বাঙালির প্রতি, বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি, বাঙালির স্বাধীনতার প্রতি। সততার মাত্রা তীব্র ছিল বলেই কোনো দিন রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাননি। লড়াই করেছেন সাহসের সঙ্গে। তাই গুলি বঙ্গবন্ধুর বুকেই লেগেছিল, পিঠে নয়। ❑

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

মুজিব আমার

শেলী সেলিনা

মুজিব আমার স্বপ্নে আঁকা
বাংলাদেশের ছবি
মুজিব আমার প্রথম দেখা
প্রজ্জ্বলিত রবি।

মুজিব আমার অন্তর দিয়ে
প্রথম পিতা ডাকা।
মুজিব নামের ছবি আছে
বাংলাদেশে আঁকা

মুজিব আমার ষড়ঋতু
মুজিব বারো মাস
মুজিব আমার অস্তিত্ব
মুজিব বাঁচার আশ।

কলাপাতা ও লাল জবাফুল

ইমদাদুল হক মিলন

নয়ন দৌড়াতে দৌড়াতে এল।

গ্রামে ঢোকার মুখে বিশাল কাঠের ব্রিজ। সেই ব্রিজের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকজন। ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিককার ভোরবেলা। কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে মাঠঘাট, মানুষের ঘরবাড়ি। খালের পানিতে ভাসছে কুয়াশা।

ভিড় ঠেলে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গেল নয়ন। কমান্ডারের কাঁধে স্টেনগান, কোমরে গুলির বেল্ট। অন্যদের হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল। গুলির বেল্ট তো আছেই। কারো কারো সঙ্গে গ্রেনেড। মোট একুশজন মুক্তিযোদ্ধা।

কমান্ডারের নাম নাসির। ভিড় ঠেলে নয়নকে আসতে দেখে তিনি তার দিকে তাকালেন। নয়ন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কমান্ডার সাহেব, আমার বড়ো ভাইও মুক্তিযোদ্ধা। তার নাম বাদল। বাদল মির্জা।

নাসির কমান্ডারের মুখটা উজ্জ্বল হলো। তাই নাকি? বাদলকে তো আমি চিনি। মেলাঘরে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি। তুমি বাদলের ছোটো ভাই?

জি। আমরা তিন ভাইবোন। বাদলদা সবার বড়ো। তারপর বোন তারপর আমি।

ইসমাইল লোকটা মাতব্বর গোছের। আগ বাড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস আছে। লুঙ্গির ওপর ছেঁড়া কালো কোট পরা। বলল, ভবেরচরের মুক্তিযোদ্ধাগো বাড়িঘর তছনছ করছে রাজাকাররা। নয়নরা তো বাড়িতে থাকতেই পারে নাই। বাড়ি দখল করছিল এক রাজাকারে। মির্জা সাহেব চইলা গেছিলেন দিঘিরপারের ওই দিককার এক গ্রামে। কয়দিন আগে ভবেরচরের রাজাকার আলবদররা সব পলাইছে। মুসলিম লীগের লোক আছিল চেয়ারম্যান সাবে, সেও পলাইছে। তারপর মির্জা সাবে নয়নগো লইয়া গেরামে ফিরছে। ভবেরচর অহন স্বাধীন।

তবে বিপদ আপনাদের কাটেনি। কাল বিকালে খবর পেয়েছি আজ এদিকে মিলিটারি আসতে পারে। ওরা বুঝে গেছে দেশ স্বাধীন হতে আর সময় লাগবে না। এজন্য মরণ কামড় দিচ্ছে।

মিলিটারি আসতে পারে শুনে লোকজন আতঙ্কিত হলো। ভয়ার্ত চোখে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল।

জয়নাল বলল, হায় হায়, মিলিটারি আইলে তো সব্বনাশ! গেরামের লোকজন বেবাক মাইরা

ফালাইব। বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিব। তয় আমরা যাই কমান্ডার সাব। বউ পোলাপান, মা-বাপ, ভাই-বইন লইয়া পলাই।

না না পালানোর দরকার নেই। মিলিটারি যাতে গ্রামে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করুন। ওরা যে এদিকে আসবেই আমি তা বলিনি। বলেছি আসতে পারে। আসার সম্ভাবনা বেশি আলিপুর আর মধ্যবাউসিয়ার দিকে। এজন্য ওদিককার ব্রিজ দুটো উড়িয়ে দিয়েছি। এখন আমরা ওইদিকে চলে যাচ্ছি। মিলিটারি এলেই অ্যাটাক করব। একটাকেও বাঁচতে দেবো না।

হাফেজ মিয়া বলল, তয় আমরা অহন কী করুম?

ব্রিজটা ভেঙে ফেলুন। মেইন রোড থেকে গ্রামে ঢোকার এই একটাই পথ। এটা ভেঙে ফেললেই কাজ হয়ে যাবে। তারপরও সাবধানে থাকবেন সবাই।

নাসির কমান্ডার নয়নের দিকে তাকালেন। তোমরাও বসে থাকবে না। তোমাদের বয়সি ছেলেরাও অনেকে মুক্তিযোদ্ধা। ব্রিজ ভাঙার কাজে লাগো।

নয়ন গভীর উৎসাহের গলায় বলল, ঠিক আছে দাদা।

নয়নের মুখে ‘দাদা’ শব্দটা শুনে নাসির কমান্ডার একটু আবেগে আপ্লুত হলেন। নয়নের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমার ভাইবোনরাও আমাকে দাদা ডাকে। অনেকদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয় না। দেশ স্বাধীন করে বাড়ি ফিরব। জয় বাংলা।

নয়ন আকাশের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে বলল, জয় বাংলা।

মুক্তিযোদ্ধারা চলে যাওয়ার পর ইসমাইল বলল, এহেনে খাঁড়াইয়া থাকবেননি মিয়ারা? লন পোল ভাঙ্গনের কামে লাইগা যাই। কুড়াল শাবল যার বাড়িতে যা আছে লইয়াহেন। বেবাকতে হাত লাগাইলে দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই পোল ভাইঙ্গা ফালান যাইব।

হাবিব নামের একজন বলল, আরে না মিয়া, এক-দেড়ঘণ্টার বেশি লাগব না।

মনির হোসেন বলল, প্যাঁচাল না পাইরা কামে লাগো মিয়ারা।

নয়ন বলল, আমাদের বাড়িতে কুড়াল আছে। আমি নিয়া আসতেছি।

বাড়ির দিকে দৌড় দিল নয়ন। নয়নের সঙ্গে দৌড় দিল মোস্তফা। এই প্রথম মোস্তফাকে দেখতে পেল নয়ন। দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, তুমি আসছ কখন?

তোমারে দৌড় দিতে দেইখা আমিও দৌড় দিছিলাম মিয়াভাই। গেরামে মুক্তিবাহিনী আইছে, দেখুম না তাগো?

তাহলে আমার আর বাড়ি যাওয়ার দরকার কী? তুমিই কুড়ালটা নিয়া আসো।

না না তুমিও লও। নাইলে মির্জা সাবে আর আম্মায় আমারে আইতে দিবো না। মির্জা সাবের জ্বর। বাড়িতে কাম কাইজ আছে। আমি না আইতে পারলে তুমি কুড়ালডা লইয়া আইবা।

মোস্তফার বয়স এখন তেইশ-চব্বিশ বছর। রোগা -পাতলা শরীর। ছোটোবেলা থেকে মির্জা বাড়িতে থাকে। এতিম ছেলে। কাছের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। মির্জা বাড়িই তার বাড়ি, নয়নরাই তার সব। মির্জা সাহেব বিয়ে ঠিক করেছিলেন মোস্তফার। গজারিয়ার মেয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দেখে বিয়ে আটকে আছে। দেশ স্বাধীন হলে বিয়ে হবে। বউ নিয়ে মির্জা বাড়িতেই থাকবে সে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাড়ির কাজ করবে।

মির্জা বাড়ির রান্নাঘরে এখন নাশতা তৈরি করছেন আমেনা বেগম। পুরনো শাল গায়ে জড়িয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে আছেন মির্জা সাহেব। খুক খুক করে কাশছেন। দিন সাতেক আগে বাড়ি ফিরেছে নয়নরা। বদু রাজাকার বাড়ি দখল করেছিল। দামি জিনিসপত্র সবই সরিয়ে ফেলেছে। বাড়িতে বলতে গেলে নেই কিছুই। বারান্দার চেয়ারটা রয়ে গিয়েছিল। মোস্তফার নড়বড়ে চৌকিটা রয়ে গিয়েছিল। এই শীতে মেঝেতে ঘুমাতে হচ্ছে নয়নদের। হাঁড়ি-পাতিল কিছু জোগাড় করেছেন আমেনা বেগম। থালাবাসন জোগাড় করেছেন। সংসার চলছে কোনোরকমে।

বাড়ি ঢুকে লাকড়ি-খড়ি রাখার ঘরটায় ঢুকল নয়ন। পুরনো কুড়ালটা পড়ে আছে একপাশে। সেটা নিয়ে দৌড় দেবে, মির্জা সাহেব বললেন, কুড়াল নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?

ব্রিজ ভাংতে যাচ্ছি বাবা। গ্রামে মিলিটারি আসবে।

বুদ্ধি করে মোস্তফাকেও সঙ্গে নিল নয়ন। মোস্তফা ভাই, তুমিও চলো। ব্রিজ ভেঙে ফেললে গ্রামে মিলিটারি ঢুকতে পারবে না।

আমেনা বেগম বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। মিলিটারি আসার খবরে ভয় পেয়েছেন। দিশেহারা গলায় বললেন, সর্বনাশ! তোর বাবার জ্বর। মিলিটারি এলে পালাবো কোথায়?

যাতে আসতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতেই যাচ্ছি মা। মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজ ভাংতে বলে গেছেন।

তোর যাওয়ার দরকার নাই। ও নয়ন, তোর যেতে হবে না বাবা। মোস্তফা যাক। তুই বাড়িতেই থাক। আমার ভয় করছে।

না না। কমান্ডার সাহেব বলেছেন। যেতেই হবে।

মির্জা সাহেব কী বলতে গেলেন কাশির তোড়ে বলতে পারলেন না। নয়ন কুড়াল হাতে দৌড় দিল। মোস্তফা ছুটল তার পিছন পিছন।

ব্রিজ ভাঙা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ভারি কাঠের শক্ত ব্রিজ। অনেকদিনের পুরনো। তবে এখনও শক্তপোক্ত। ভাঙা কঠিন। লোকজন শাবল কুড়াল নিয়ে

সমানে কোপাকুপি করছে। নয়নের বয়সি জনাদশেক কিশোরও জড়ো হয়েছে। তারাও কাজ করছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের সবাইকেই নয়ন চিনল। এক স্কুলেরই ছাত্র সবাই। নয়নের ক্লাসমেটই আছে চারজন। ক্লাস ফাইভে পড়ে।

নয়নকে কুড়াল হাতে দেখে তাদের ক্লাসের আউয়াল এগিয়ে এল। দে নয়ন, আমাকে দে। আমি কিছুক্ষণ কোপাই। আমি টায়ার্ড হলে তুই কোপাবি। দৌড়ে এসেছিস। একটু জিরিয়ে নে।

নয়নের হাত থেকে কুড়াল নিয়ে ব্রিজে চড়ল আউয়াল।

এইভাবে কুড়ালটা ঘুরতে লাগল। নয়নের হাত থেকে গেল শাহাদাতের কাছে, শাহাদাতের হাত থেকে রবিউলের হাতে। প্রত্যেকেই শরীরের সব শক্তি দিয়ে ব্রিজ ভাঙার কাজ করছে। তবে কাজ বেশিদূর আগাচ্ছে না। পুরনো ব্রিজ ঠিকই কিন্তু কাঠ এত শক্ত, লোহারপাত, গজাল এগুলো এত কঠিনভাবে লাগানো হয়েছে, এই শীতেও ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে লোকজনের।

আমিনুদ্দিন নামের মুসল্লি ধরনের মানুষটি শাবল চালাতে চালাতে বললেন, শুনেছি মিলিটারিরা বলে মুসলমান। মুসলমান হইয়া মানুষ মারে? মুসলমান মারে? ওরা তো মুসলমান না। ওরা হইল শয়তান, শয়তান। ইবলিস শয়তান।

আনসার আলী কুড়াল চালিয়ে ক্লান্ত। দাঁড়িয়ে জোড়ে জোড়ে ক্লান্তির শ্বাস ফেলছে। সেই অবস্থায় বলল, বাড়িতে বউ পোলাপানরে বইলা আইছি আমি পোল ভাংতে গেলাম। মিলিটারি আইলেই দৌড়াদৌড়ি চিল্লাচিল্লি শুরু হইব। ওই রকম আওয়াজ পাইলে এক মিনিটও দেরি করবা না। দক্ষিণ দিকে দৌড় দিবা। যে যেইভাবে পারো পলাইবা।

মফিজউদ্দিন বলল, আমিও কইয়াছি। বেবাকতেই ডরাইতাছে। মে মাসের কথা কইল পোলাপানের মায়। তিনশো ষাইটজন মানুষ মারছিল আমগো এলাকায়। এক সকালে এতডি মানুষের জান নিল ওরা। আইজ আইলে না জানি কী করে।

সোলায়মান মাস্টার বললেন, আসতে যাতে না পারে সেই জন্যই তো পোল ভাংতে কইয়া গেল নাসির কমান্ডারে। কাম করেন মিয়ারা। তাড়াতাড়ি হাত চালান।

হোসেন বেপারি কুড়ালের বিরাট একটা কোপ বসালো চওড়া কাঠের ওপর। সেই অবস্থায় বলল, চেষ্টা তো চলতাছে মাস্টার সাব। কেউ তো বইসা নাই। তারপরও দেখেন, কাম আগাইতাছে না।

ইউনুস মিয়া বলল, কামডা আউলা ঝাউলা হইতাছে। যে যেই দিক দিয়া পারে কুড়াল-শাবল মারতাছে। এইভাবে হইব না। এক দিক দিয়া ভাংতে হইব। ও মিয়ারা, একদিক দিয়া ভাঙেন।

নয়ন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। কুয়াশা আগের মতোই। বেশিদূর চোখ চলে না। রোদ কখন উঠবে কে জানে! ব্রিজ ভাঙার কাজ কখন শেষ হবে কে জানে! আলিপুরের দিকে, মধ্যবাউসিয়ার দিকে মিলিটারি এসে পড়ল কিনা কে জানে!

না আসেনি। এলে গুলির শব্দ পাওয়া যেত। নাসির কমান্ডার বলে গেছেন তারা ওই দিকে পজিশন নিয়ে থাকবেন। মিলিটারি এলেই অ্যাটাক। এলে এতক্ষণে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেত। শব্দ পাওয়া যেত।

কিন্তু ব্রিজ ভাঙার কাজ আগাচ্ছে না কেন? আর কতক্ষণ লাগবে? শয়তানগুলো যদি আলিপুর মধ্যবাউসিয়ার দিকে না গিয়ে এদিকে চলে আসে?

হলোও তাই।

দূরের রাস্তার দিকে গাঢ় সাদা কুয়াশার ভিতর দেখা গেল গাড়ির হেডলাইট জ্বলছে। কুয়াশা ভেঙে এগিয়ে আসছে কয়েকটা গাড়ি। এখনও দূরে আছে বলে শব্দ তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত এদিকে আসছে গাড়িগুলো।

এই দৃশ্য প্রথমে দেখল রামমোহন। সে কুড়াল চালিয়ে ক্লান্ত। জিরাবার জন্য দাঁড়িয়েছে। তখন দেখে সারি ধরে গাড়ি আসছে এই দিকে। কুয়াশায় রাস্তাঘাট দেখা যায় না বলে দিনেরবেলাই জ্বলছে গাড়ির হেডলাইট।

ব্রিজ আধাআধি ভাঙা হয়েছে তবে হয়েছে এলোমেলোভাবে। গাড়ি চলতে পারবে না কিন্তু মিলিটারিরা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে আসতে পারবে।

রামমোহন তারপর চিৎকারটা দিল। মিলিটারি আইতাছে, মিলিটারি আইতাছে। ওই যে আইয়া পড়ছে। পোল ভাংতাছে দেখলেই গুলি শুরু করব।

মুহূর্তে সাড়া পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে। দিশেহারা ভঙ্গিতে রাস্তার দিকে তাকালো তারা। কুড়াল-শাবল হাতেই দৌড় দিল কেউ, কেউ দৌড়ালো ওসব ফেলেই। কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। 'মিলিটারি আইতাছে, মিলিটারি আইতাছে' বলে চিৎকার আর দৌড়। বিরাট হুড়াহুড়ি পড়ে গেল।

নয়ন আউয়ালরা প্রথমে বুঝতে পারেনি ঘটনা কী! মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই নানা রকম গুজব রটছে চারদিকে। মিলিটারি আসছে, ওই এসে পড়েছে, এরকম গুজব রটেছে বহুবার। মানুষজন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। পরে দেখে কোথায় মিলিটারি? কিচ্ছু না।

এখনও কি তেমন কিছু রটল?

না। ওরা স্পষ্টই দেখতে পেল মিলিটারি ব্রিজের ওইপারে প্রায় এসেই পড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

কে যেন চিৎকার করে বলল, দৌড় দে নয়ন। দৌড় দে।

বড়োরা প্রায় সবাই উধাও হয়ে গেছে। নয়নরা দশ কিশোর দেরি করে ফেলেছে। তার পরও প্রাণপণে দৌড় শুরু করল ওরা...

মিলিটারিরা তখন দ্রুত এবং সাবধানে আধভাঙা ব্রিজ পার হচ্ছে। হাতে রাইফেল। রাইফেলের মাথায় বেয়নেট। শিকার ধরার সময় যে রকম ক্ষিপ্ত হয় চিতাবাঘ, মিলিটারিরা সে রকম ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছে।

নয়নরা এখন কোথায় যাবে? কোন দিকে পালাবে?

ব্রিজের এপারে এসেই চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে মিলিটারিরা। চারদিক দিয়ে ঘেরাও করছে গ্রাম।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে ওরা। বুক ওঠানামা করছে হাঁপড়ের মতো। তিন দিক দিয়ে মিলিটারি এগিয়ে আসছে তাদের দিকে...

সামনে বহুদিনের পুরনো কবরস্থান। গাছপালা ঝোপঝাড়ে ঘেরা। শীতে কুয়াশায় জবুথবু হয়ে আছে জায়গাটা। দৌড়াতে দৌড়াতে নয়ন বলল, আউয়াল, কবরস্থানে ঢোক। কবরস্থানে। কবরস্থানে ঢুকে ওরা আমাদের মারবে না।

দশ কিশোর কবরস্থানে ঢুকল। ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা সবাই। দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত। কেউ কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল পায়ে লতাপাতা জড়িয়ে। মতিউর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

মিলিটারিরা তখন কবরস্থানের দিকে ছুটে আসছে। তাদের বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

নয়ন বলল, চল, আমরা একেকজন একেকটা কবর ধরে বসে থাকি। মিলিটারিরা কাছে আসার আগ থেকেই জোরে জোরে সুরা ফাতিহা পড়ব। ওরা মুসলমান আমরাও মুসলমান। ছোটো ছেলেরা কবরস্থানে বসে সুরা পড়ছে দেখলে মারবে না। কিছুই বলবে না।

পাশাপাশি কবরগুলোর ধারে বসল ওরা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেকজনের। ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেউ কেউ। সেই কান্না গোঙানির মতো শোনাচ্ছে।

মিলিটারিরা ঢুকে গেল কবরস্থানে।

নয়নরা জোরে জোরে সুরা ফাতিহা পড়তে লাগল। 'আল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর রাহ্‌মানির রাহিম...'

কারও গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে কান্নার মতো করে, কারও গলা ফ্যাসফ্যাসে। শব্দ বোঝা যায় না।

চারজন-পাঁচজন করে মিলিটারি রাইফেল বুকের কাছে ধরে একেক কবরের দিকে এগোতে লাগল। গুলি করছে না। চারদিক থেকে বেয়নেট চার্জ করার জন্য ধীর পায়ে এগোচ্ছে। মুখে কোনো শব্দ নেই। নয়নরা চোখ বুজে উচ্চস্বরে সুরা ফাতিহা পড়ে যাচ্ছে। 'আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আর রাহ্‌মানির রাহিম...'

সাতচল্লিশ বছর পর

আস্‌সালামু আলাইকুম আন্টি।

ওয়ালাইকুম আসসালাম।

আমি আপনাদের দোতলার ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। কালই ফ্ল্যাটে উঠেছি। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এত ব্যস্ততায় গেল কালকের দিনটা। বাসা বদলানো যে কী ঝামেলার কাজ!

আমেনা বেগম চোখ তুলে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। তাঁর বয়স হয়েছে আশির কাছাকাছি। চশমা ব্যবহার করেন অনেক বছর। কয়েক মাস ধরে চোখে ঝাপসা দেখছিলেন শুনে বাদল তার ছোটো ছেলে সাজিদকে পাঠালো। নাতি এসে ঢাকায় নিয়ে গেল দাদিকে। চোখের ভালো ডাক্তার দেখালো। পাওয়ার বেড়েছে। নতুন চশমা নিতে হলো। সেই চশমায় সবকিছু এখন পরিষ্কার দেখতে পান।

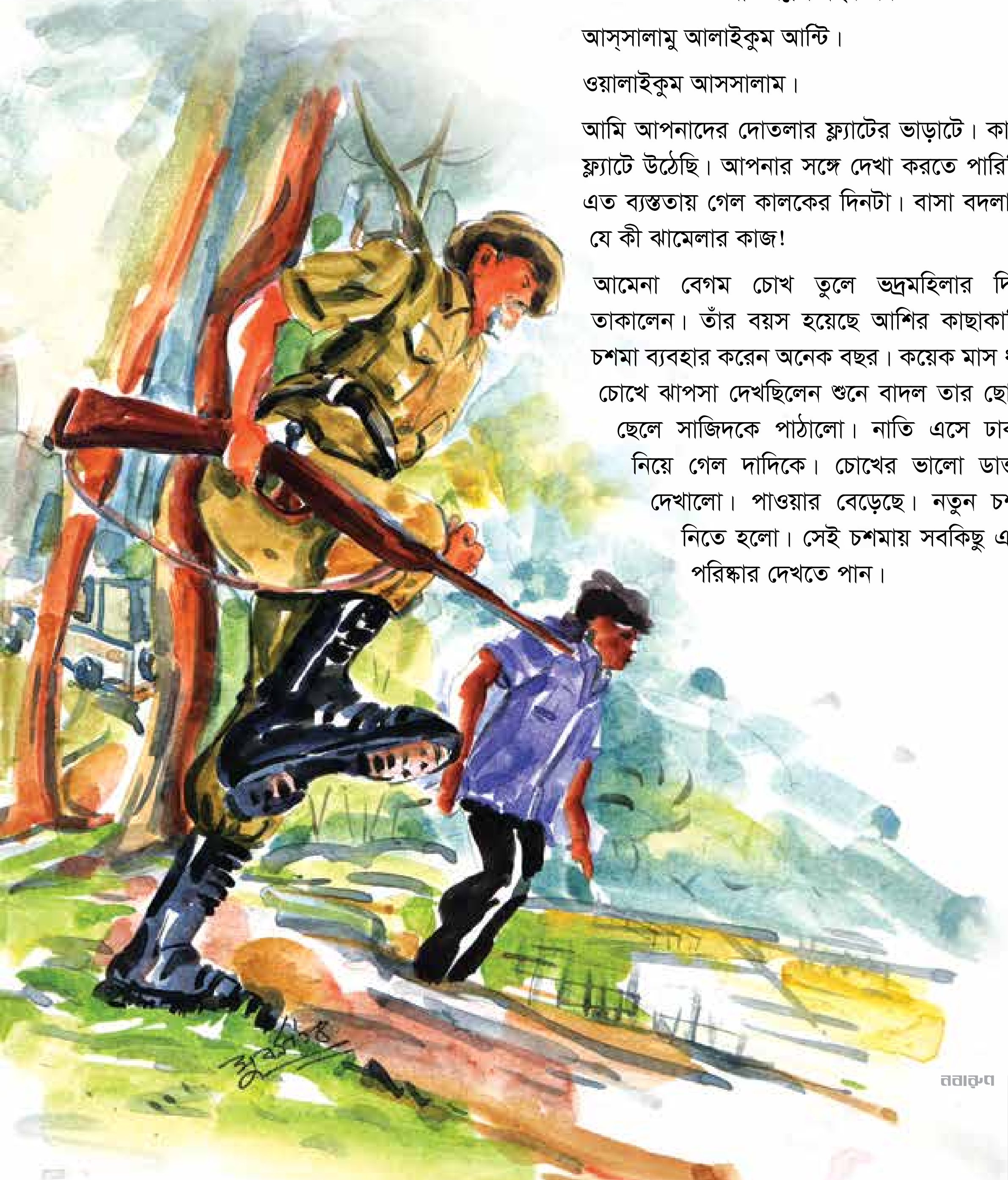

ভদ্রমহিলার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। স্বাস্থ্য ভালো। গায়ের রং শ্যামলা। চেহারা মন্দ না। হাসিখুশি ধরনের মানুষ।

তোমার নাম কী মা?

আয়েশা।

বসো, বসো।

আয়েশা চেয়ার টেনে বসল। আমার হাজব্যান্ড এখানকার কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। আগে ছিলেন মানিকগঞ্জে। আমরা পাবনার লোক। একটাই ছেলে আমাদের।

আমেনা বেগম বুঝলেন আয়েশা গল্প করতে পছন্দ করে। ভালোই হলো। গল্প করার মানুষ পাওয়া গেল।

চা খাবে?

খেতে পারি। লিকার চা। দুধ চিনি ছাড়া।

আমিও তাই খাই।

আমেনা বেগম রাজিয়াকে ডাকলেন। রাজিয়া, দু'কাপ চা দিতে বলো। লিকার চা।

মোস্তফার ছোটো মেয়ে রাজিয়া বারান্দায় পায়চারি করতে করতে পড়ছে। ভবেরচর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। পড়াশোনায় খুবই আগ্রহ মেয়েটির। পরীক্ষার বাকি আছে মাস তিনেক। এ প্লাস পেতেই হবে। এজন্য রাতদিন পড়ছে।

আমেনা বেগমের কথা শুনে তাঁর দিকে তাকালো না রাজিয়া। পড়তে পড়তেই চিৎকার করে মাকে বলল, দাদির ঘরে দুইকাপ চা দাও।

মোস্তফার বউয়ের নাম বেদানা। সে ছিল রান্নাঘরে। সংসার সেই সামলায়। বাড়ির সব কাজ তার। বাইরের কাজ মোস্তফার। দু-দিন হলো মোস্তফা বাড়িতে নেই। বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছে নারায়ণগঞ্জের বন্দরে। সেই মেয়ে তার জান। মাসে এক-দু'বার মেয়ের কাছে গিয়ে থেকে আসে।

ট্রেতে দু'কাপ চা নিয়ে এল বেদানা। ষাটের কাছাকাছি বয়স। দেখলে মনেই হয় না এতটা বয়স হয়েছে। বেশ শক্তপোক্ত কর্মঠ মানুষ।

নাও মা, চা নাও।

আয়েশা চা নিল। আমেনা বেগমও নিলেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে আয়েশা বলল, একটা কথা আপনাকে বলে রাখা ভালো আন্টি। যাতে আপনি পরে বিরক্ত না হন বা না ভাবেন যে কেন আপনাকে আগে বলিনি।

কী কথা মা?

আমার ছেলেটার কথা। একটু অন্য টাইপের ছেলে। এগারো বছর বয়স। পড়ে ক্লাস ফাইভে। না না, দুষ্টুমি করে না। নিজেকে নিয়ে থাকে। ছবি আঁকে। মাটি দিয়ে এটা ওটা বানায়। ফুল-পাতা দিয়েও বানায়। শহিদমিনারের ছবি আঁকে, গ্রামের ছবি আঁকে, মুক্তিযুদ্ধের ছবি, পতাকার ছবি এসব নিয়েই থাকে।

ভালো তো! এই নিয়ে বলার কী আছে?

না মানে আপনার বাড়িতে এত গাছপালা। কখন কোনদিকে হাত দিবে সে, কোন গাছের ডালপালা ভাঙবে, ফুল ছিঁড়বে...মানে আমি আর ওর বাবা ওকে কিছু বলি না। আমাদের ধারণা ছেলেটা বড়ো হয়ে আর্টিস্ট হবে।

এগারো বছর বয়স বললে? ক্লাস ফাইভে পড়ে?

জি আন্টি।

নাম কী?

নয়ন।

আমেনা বেগম কেঁপে উঠলেন। নয়ন? নয়ন?

আয়েশা অবাক। জি আন্টি। ডাকনাম নয়ন। ভালো নাম...

না না অন্য কোনো নাম জানবার দরকার নেই। নয়ন, নয়ন...

আমেনা বেগম উদাস হলেন। স্মৃতিকাতর হলেন। আমার ছেলেটার নামও ছিল নয়ন। এগারো বছর বয়স। ক্লাস ফাইভে পড়ত।

তাই নাকি? আশ্চর্য মিল। আপনার সেই ছেলে কোথায়?

আমেনা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই মাটিতে, ওই নদীতে, ফসলের মাঠে আর আকাশে মিশে আছে আমার নয়ন।

কথাটা বুঝতে পারল না আয়েশা। আমেনা বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আয়েশাকে একাত্তর সালের সেই দিনটির কথা বললেন আমেনা বেগম। ...কবরস্থানে আশ্রয় নেওয়া নয়নদের দশজনকে গুলি করেনি জন্তুরা। চারদিক দিয়ে বেয়নেট চার্জ করেছিল। এলাকার সব মানুষ পালিয়েছিল। দশটি কিশোরের মরণ চিৎকার আর আর্তনাদ কেউ শুনতে পায়নি। কবরস্থানের মাটি তাদের রক্তে ভিজে

গিয়েছিল। জন্তুরা চলে যাওয়ার পর একজন দুজন করে ফিরেছিল গ্রামের লোক। যার যার ছেলে নিখোঁজ ছিল তারা বেরিয়েছিল ছেলে খুঁজতে। মির্জা সাহেব আর মোস্তফার সঙ্গে আমিও বেরিয়েছিলাম। নয়ন ছিল আমার জীবন। তাকে ছিন্নভিন্ন শরীর কবরস্থানে পড়ে থাকতে দেখে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম...। নয়নের শোক নিয়ে আমি বেঁচে আছি। মির্জা সাহেব বেশিদিন বাঁচলেন না। বাড়িটা তখন এরকম ছিল না। বারান্দাঅলা টিনের ঘর ছিল। সেই বারান্দায় বসে ছেলের জন্য কাঁদতেন। কবরস্থানে গিয়ে বসে থাকতেন। আমিও যেতাম। দিন নেই রাত নেই, যখন ইচ্ছা চলে যেতাম কবরস্থানে। আমার নয়ন যেখানে পড়েছিল সেখানে গিয়ে বসে থাকতাম। নয়নের কবরে হাত বুলাতাম। যেন ছেলের বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি...

দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেললেন আমেনা বেগম। দিনে দিনে সেই কষ্টটা কমে গেছে মা। এখন মনে হয় অন্যকথা। ভাবি, আমি তো স্বার্থক মা। আমার বাদল মুক্তিযোদ্ধা আর নয়ন দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে। মা হিসেবে আমার আর কী চাওয়ার আছে? নয়নের জন্য আমার মেয়েও খুব গৌরব করে। বাদল গৌরব করে। আমার নাতি নাতনিরা গৌরব করে। তোমার নয়নকে বলো সে স্বাধীন বাংলাদেশে বড়ো হচ্ছে। সে তার মতো করে বড়ো হোক। স্বাধীনভাবে বড়ো হোক। তার ভালো লাগা নিয়ে বড়ো হোক। আর আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে একটু দেখব।

সেদিন দুপুরের পরই নয়নকে দেখতে পেলেন আমেনা বেগম। বেদানা খুবই বিরক্ত হয়ে এসে বলল, নতুন ভাড়াইটার পোলাটা কলাপাতা কাটছে, লাল জবাফুল পাইড়া ওই যে দেখেন উঠানের কোণায় বইসা কী কী করতাছে। আমি না করছি। কথা শোনে নাই।

তাই নাকি। চল তো দেখি কী করে?

আমেনা বেগমের হাঁটতে অসুবিধা হয়। হাঁটুতে ব্যথা আছে। বেদানা বা রাজিয়াকে ধরে হাঁটেন। এখনও তাই করলেন। বেদানার বাহুর কাছটা শক্ত করে ধরে উঠানে এলেন।

উঠানের কোণে বড়ো একটা কলাপাতা চারকোণা করে কেটে মাটিতে বিছিয়েছে নয়ন। দশটা লাল টকটকে জবাফুল এখন সেই কলাপাতার ঠিক মাঝখানে গোল আর ঘন করে বসাচ্ছে। খুবই মন দিয়ে কাজটা সে করছে। কোনো দিকে খেয়াল নেই।

আমেনা বেগম মায়াবি গলায় ডাকলেন, নয়ন।

নয়ন চোখ তুলে তাকালো। কথা বলল না।

কী করছ? তোমার কথা আমি শুনেছি। তোমার মা বলেছে। এটা কী হচ্ছে?

হাতের কাজ শেষ করে নয়ন উঠে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বলল, বুঝতে পারোনি?

না। জিনিসটা কী?
খেয়াল করে দেখো।
দেখছি কিন্তু বুঝতে পারছি না।

আরো খেয়াল করে দেখো। তাহলেই বুঝতে পারবে। খুবই সহজ।

এবার মুখ উজ্জ্বল হলো আমেনা বেগমের। শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, বুঝেছি বুঝেছি। বাংলাদেশের পতাকা। সবুজ কলাপাতার মাঝখানে গোল করে রাখা লাল জবাফুল। বাহ্। দারুণ।

মা বলেছেন, তোমার ছোটো ছেলের নামও ছিল নয়ন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। নয়নদের বাড়িতে আরেক নয়ন। এক নয়ন মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন আরেক নয়ন তাঁদের বাড়িতে কলাপাতা আর জবাফুল দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করছে। নয়নরা দশজন একসঙ্গে শহিদ হয়েছিলেন। এজন্য দশটা লাল জবা।

নয়নের কথা শুনে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন আমেনা বেগম। অনেকদিন পর ছেলের জন্য কাঁদছেন তিনি। ❑

কথাসাহিত্যিক ও সম্পাদক, কালের কণ্ঠ

কবিতাগুচ্ছ

স্বাধীনতা

বর্ণালী সান্যাল

রক্তে পাওয়া স্বাধীনতা আমার
কতই না মূল্যবান!
জীবনের নানান রং, নানান দিক
সে তো তোমার জন্যই পাওয়া
হে স্বাধীনতা! তবু কেন আজ
বিজয়ের এত বছর পরেও
স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন সবার মনে!
আমি তো ভাবি স্বাধীনতা মানে আমার ভাষা,
আমার মা, আমার বঙ্গবন্ধু
তবু কোথায় একটু দ্বিধা, একটু বিভেদ।
বঙ্গবন্ধু তুমিতো দিয়েছিলে সোনার বাংলা
রবি ঠাকুরের অমোঘ বাণী মিথ্যা করে
আজ শোষিতের হাতে তোমার প্রাণ হারিয়ে
প্রমাণ করলে কবির সেই বাণী মিথ্যা নহে।

স্বাধীনতা আমাদের

খোরশেদ আলম নয়ন

স্বাধীনতা প্রিয় ফুল -প্রিয় নদী-প্রিয় মাঠ
স্বাধীনতা এক বুক -স্বপ্ন কেনার হাট।
স্বাধীনতা শ্রাবণের- রিমঝিম বৃষ্টি
স্বাধীনতা বালুচর -সুদূরের দৃষ্টি।

স্বাধীনতা নিক্কণ-কিশোরীর নূপুরের
স্বাধীনতা নিরবতা -ঘুঘু ডাকা দুপুরের।
স্বাধীনতা মেঘনার -ঢেউ ভাঙা ডিঙি নাও
স্বাধীনতা শৈশবে হারানো -স্মৃতির গাঁও।

স্বাধীনতা পাহাড়ের -আত্মজা ঝর্ণা
স্বাধীনতা বাংলার-শ্যামলী সুবর্ণা
স্বাধীনতা সবুজের হাতছানি পিছু ডাক
স্বাধীনতা ছেলেবেলা -মেঘনা নদীর বাঁক।

স্বাধীনতা জননীর দুটি চোখ ছলছল
স্বাধীনতা শহিদের -তাজা স্মৃতি ঝলমল।
এ শ্যামল প্রান্তরে যতই আসুক ঝড়
স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্নের বাতিঘর!

মুক্তির মহামন্ত্র

আবদুল লতিফ

মুক্তির পথে জোগায় প্রেরণা
৭ই মার্চের ভাষণ
অঙ্গুলি ইশারায় কেঁপে উঠেছিল
শত্রু সেনার আসন।

কেঁপে উঠেছিল রেসকোর্স ময়দান
কেঁপে উঠেছিল বিশ্ব
কেঁপে উঠেছিল থরথর করে
পাক হানাদার শিষ্য।

এক ভাষণেই জেগে উঠেছিল
লক্ষ কোটি প্রাণ
সেই ভাষণেই পেয়েছিল সবাই
স্বাধীনতার ঘ্রাণ।

পথে নেমে আসে লাখো জনতা
আহবানে দিয়ে সারা
যাঁর যা ছিল তা নিয়েই
ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁরা।

একটা ভাষণই বাঙালি জাতির
মুক্তির মহামন্ত্র
সেই মন্ত্রই দিয়েছে স্বাধীনতা
ভেঙে সব ষড়যন্ত্র।

ভাষণ

নূর আলম গন্ধী

ভাষণ তো নয় ছিল যে তা
মুক্তিরই বার্তা
বলতে পারো সেই সে ভাষণ
ছিল কার তা?

ভাষণ তো নয় ছিল যে তা
জাগরণী গান
সেই সে গানে জেগেছিল
কোটি কোটি প্রাণ।

ভাষণ তো নয় ছিল যে তা
শক্তি সাহস বল
মুক্তিকামী বীর জনতার
নেমেছিল ঢল।

ভাষণ তো নয় ছিল যে তা
যুদ্ধ জয়ের বাণী
দেশ-বিদেশের সবাই আজও
অমর কাব্য মানি।

ভাষণ তো নয় ছিল যে তা
চেতনারই সুর
একাত্তরের ৭ই মার্চে
কণ্ঠ বঙ্গবন্ধুর।

গল্প

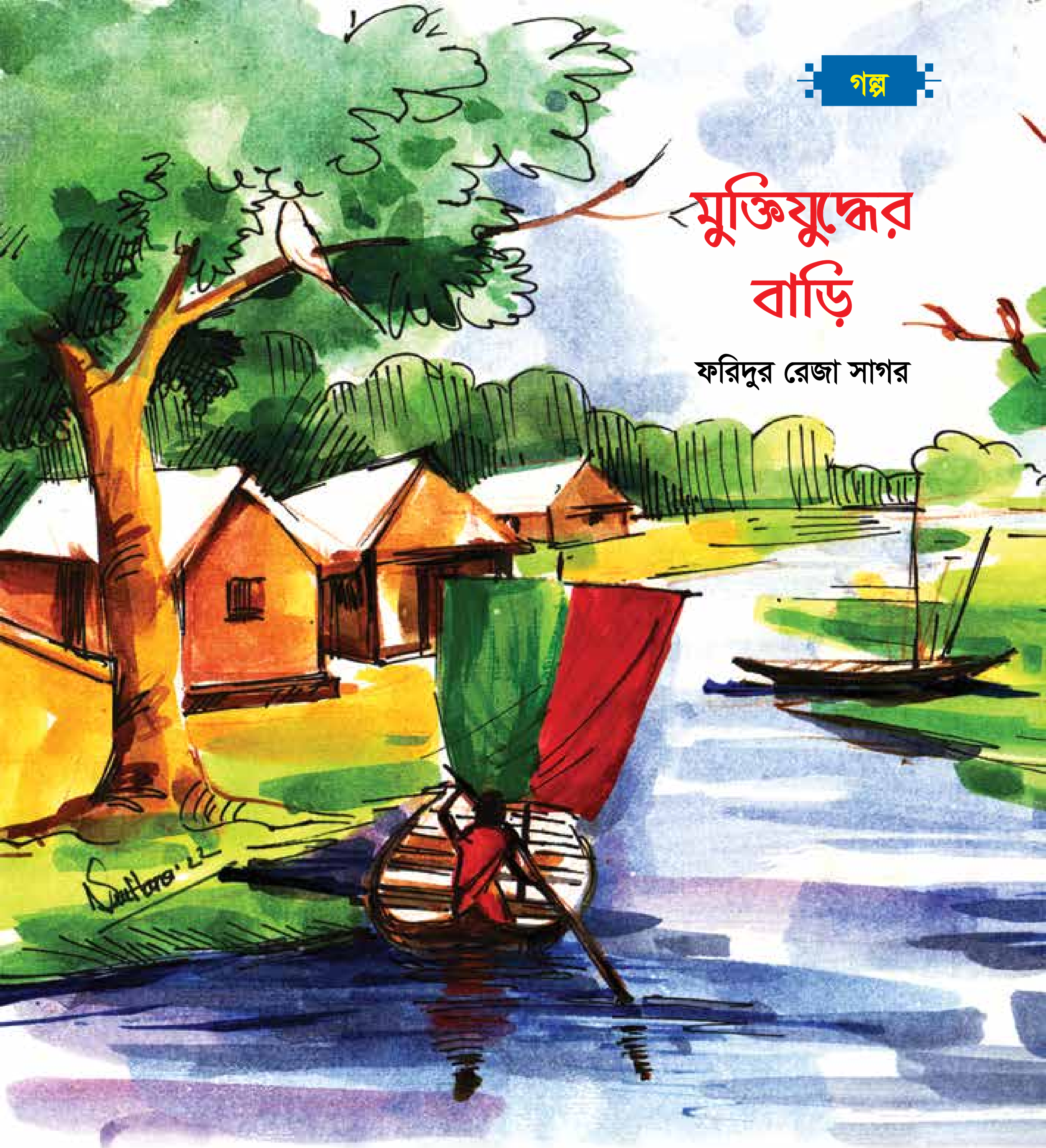

মুক্তিযুদ্ধের বাড়ি

ফরিদুর রেজা সাগর

গ্রামের নাম নাগরপুর। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মধুমতী নদী। বাসস্ট্যান্ড থেকে নেমে ভ্যানগাড়িতে চেপে দশ মিনিট লাগল আমতলায় আসতে। একটু দূরে হাট বসে-সপ্তাহে দুইদিন।

রাশেদের মনটা আনন্দে ভরে গেল। এই আমতলাতেই একদিন মুক্তিযুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল তার বাবা। মরহুম শাখাওয়াত হোসেন। এখান থেকে আরও মিনিট কুড়ি লাগবে গ্রামের বাড়ি যেতে। কিন্তু রাশেদ এবার গ্রামের বাড়িতে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সন্ধান করতে। ছোটোবেলা থেকে বাবার মুখে যুদ্ধদিনের স্মৃতি শুনে শুনে বড়ো হয়েছে। এখন রাশেদ বড়ো চাকরি করে। বাবা মারা গেছেন। মা শয্যাশায়ী। ডিসেম্বর মাসে রাশেদের ইচ্ছা হলো, বাবারা কীভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তার ইতিহাস সন্ধান করবে। আমতলায় দাঁড়িয়ে মনটা হু হু করে উঠল রাশেদের। গ্রামের বাতাসে কেমন এক সোঁদা গন্ধ। এই আমার বাংলাদেশ। চারদিকে মন খুলে, চোখ খুলে তাকালো সে। উত্তরের হিমেল বাতাস বইছে। আজ হাট বসেনি। দু-একজন পথচারী হেঁটে যাচ্ছে গাছতলা দিয়ে।

রাশেদের খুব মনে পড়তে লাগল, বাবার স্মৃতি। বাবা বলতেন, আগস্ট মাসের কোনো একদিন এই আমগাছতলায় তারা চার বন্ধু মিলে যুদ্ধে যাবার পরিকল্পনা করে। ঢাকা শহর থেকে কীভাবে তারা পালিয়ে গ্রামে এসেছিলেন সে আর এক ইতিহাস।

বাবার সাথে আনোয়ার চাচা, ইকবাল চাচা, আর শফিক চাচা ছিলেন। তারা আখাউড়া হয়ে আগরতলা চলে যান। ট্রেনিং নিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন। শালদা নদীর তীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে গুলি খান শফিক চাচা। বাবার মতো ইকবাল চাচা, শফিক চাচা আজ আর বেঁচে নেই। বৃদ্ধ আনোয়ার চাচা এখন গ্রামেই থাকেন। গ্রামে নানা ধরনের ব্যবসার সাথে তিনি জড়িত। রাশেদ এবার আনোয়ার চাচার সাথেও সাক্ষাৎ করবে।

দুই

গ্রামে এত সুন্দর বাড়ি। বিশাল উঠোন। পেছনে বিশাল পুকুর। পুকুরের চারপাশে সুদৃশ্য বাগান।

লনে টি-চেয়ারে রাশেদ বসে আছে। আনোয়ার চাচার জন্য অপেক্ষা। এমন সময় একজন চঞ্চল মেয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,

কী নাম তোমার?

আমার নাম রাশেদ।

হ্যাঁ। আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। তোমার বাবা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। আমার বাবার সাথে যুদ্ধ করেছেন।

হ্যাঁ। সেসব অনেক গৌরবময় স্মৃতি।

হ্যাঁ। আব্বা অবশ্য সেসব স্মৃতি নিয়ে মাথা ঘামান না। তিনি আগামীতে এমপি ইলেকশন করবেন। এখন তাই গ্রাম উন্নয়নের কাজ করছেন।

আমিও আনোয়ার চাচার সঙ্গে কাজ করতে চাই।

কী কাজ করবেন আপনি?

আমি আমতলার সংস্কার করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণ করতে চাই।

ভালো কথা। বলে মেয়েটি চা ঢেলে দিলো রাশেদের কাপে।

ও হো আপনার নাম টা যেন কী বলেছিলেন?

আমার নাম রাশেদ। আপনার নাম?

রিতা। যদি কিছু মনে না করেন, তবে জিজ্ঞেস করি। আপনি কী করেন?

আমি একটা চাকরি করি। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে।

তাহলে আমার বাবার সাথে কাজ করা কঠিন হবে।

কেন?

আব্বু তো সারাক্ষণ কাজ করে। তার সাথে যারা কাজ করে তারাও চব্বিশ ঘন্টা কাজের মধ্যে থাকে।

আমিও থাকব। প্রয়োজনে চাকরি ছেড়ে দেব।

সাবাশ। আপনাকে দিয়ে হবে।

রাশেদ মনে মনে খুশি হলো। কিন্তু আনোয়ার চাচার সাথে কথা বলে চরম হতাশ। চাচা বললেন,

ওহে ইয়াংম্যান, জীবনের কঠিন বাস্তবতা এখনো দেখনি। কাঁচা আবেগ নিয়ে তুমি সবকিছু ভাবছ।

না চাচা। আমি বাস্তবভাবেই ভাবতে চাচ্ছি।

তাহলে কী করতে চাও।

আমতলাতে আমি একটা মুক্তিযুদ্ধের স্মারক জাদুঘর বানাতে চাই।

ব্যাপারটা খুলে বলো।

রাশেদ আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, এই আমতলা থেকে আপনারা প্রতিজ্ঞা করে একদিন মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন কয়েকজন বন্ধু মিলে। দেশ স্বাধীন করেছিলেন। স্বাধীন দেশ গড়ে তোলার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেখানে একটা বাড়ি বানাতে চাই। সেটা হবে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর।

আনোয়ার চাচা কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর রাশেদের দিকে তাকালেন।

বাবা, বেঁচে থাকো। আমি তোমার কথা শুনে খুব আনন্দিত। কিন্তু বাবা ওই জায়গা তো প্রমোটারদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরাট বহুতল দালান হবে। মার্কেট হবে।

এবার রাশেদ গম্ভীর হয়ে গেল।

কোনোভাবেই কি জায়গাটা রক্ষা করা যায় না?

কীভাবে করব বাবা। সব তো লিখিত চুক্তি হয়ে গেছে।

রাশেদ আমতা আমতা করতে লাগল। বুঝতে পারল আনোয়ার চাচা জায়গাটা ছাড়বে না। রাশেদ অন্য বুদ্ধি করতে লাগল।

তিন

রাশেদ সেই আমতলাতে কয়েকদিন একা একা ঘুরে বেড়ালো। একটা ছোট্ট জায়গা। এই এতটুকু। গাছের তলাটা আসল-স্থান। ওইখানে বসেই সেই চার তরুণ যুদ্ধে অংশ নেবে বলে পরিকল্পনা করে। তারপর আগরতলা চলে যান। রাশেদ ভাবতে ভাবতে যেন সেই দিনগুলোতে চলে যায়। বাবার চোখ দিয়ে সে দেখতে পায়- ১৯৭১ সাল। জুন-জুলাই মাস। অক্টোবরের স্মৃতিগুলো স্পষ্ট হয়ে ভাসতে থাকে দুই চোখে।

আমতলায় একা একা বসে নানা কিছু ভাবছিল রাশেদ। এমন সময় একটা জিপ এসে থামল আমতলায়। জিপ থেকে নামলেন আনোয়ার চাচা আর রিতা। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন। গাছের দিকে তাকালেন। চারপাশে ধু ধু প্রান্তর। সবুজ ধানক্ষেত। অবারিত মাঠ। আহা, কী সুন্দর আমার দেশ। বলে আনোয়ার চাচা মেয়ের সঙ্গে গল্প শুরু করলেন।

দেশটাকে গড়ে তুলতে হবে মা। বুঝলে? সুন্দর আমাদের দেশ। অনেক কাজ বাকি আছে মা। সে দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। এই যেমন খালি জায়গা নিয়ে রাশেদ আবেগ দিয়ে ভাবছে। এখানে সে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংগ্রহশালা বানাবে। আরে ব্যাটা-আমতলার মোড় হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মোড়। তিন রাস্তার মুখ এখানে মিলেছে। এখানে বড়ো প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বেকারদের কর্মসংস্থান করতে হবে।

রাশেদ তখন উঠে দাঁড়ালো। চাচা আপনার কথা ঠিক। বড়ো দালান উঠুক। আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু সেই বড়ো দালানের ভেতরে অল্প একটু জায়গায় কি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণশালা হতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। খুব ভালো প্রস্তাব। আজই আমি প্রমোটারদের বলে দিচ্ছি।

রিতাও খুব খুশি। বলল,

তোমার এই প্রজেক্টের নাম কী হবে বাবা?

নাম দেব মুক্তিযুদ্ধের বাড়ি। কেমন হবে?

রাশেদের চোখ জলে চিকচিক করছে। আনন্দে তার কান্না পাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের ছোট্ট স্মৃতি আসলে ছোটো নয়। মুক্তিযুদ্ধের বাড়ি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। নতুন প্রজন্মের কাছে সেটা অনেক বড়ো ব্যাপার। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

অটোগ্রাফের খাতা

আহসান হাবীব

রন্টু, মুহিব দুই বন্ধু বাসার কাছের মাঠটায় বসে গল্প করছিল।

- বুঝলি, দারুণ একটা গিফট পেয়েছি পরশু রাতে।

-কী গিফট?

- একটা অটোগ্রাফের খাতা।

- কে দিয়েছে ?

- আমার ছোটো মামা। চামড়া দিয়ে বাঁধানো খুব সুন্দর।

- কার কার অটোগ্রাফ নিলি?

- কারো না। ভাবছি...

- কী ভাবছিস?

- ভাবছি একজন মুক্তিযোদ্ধার অটোগ্রাফ দিয়ে শুরু করব।

- দারুণ আইডিয়া।

- আচ্ছা মুহিব তোর পরিচিত কোনো মুক্তিযোদ্ধা আছে?

- কেন, আমার দাদাই তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। মেজর হায়দারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তিনি একজন প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন।

- ওহ দারুণ! তাহলে উনারটাই নিব। উনি এখন কোথায়?

- উনি শহিদ হয়েছেন। যমুনা নদীর তীরে শৈল পাড়ায় একটা সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন আমার দাদা। স্টেনগান হাতে তার একটা ছবি আছে আমাদের বাসায়। কী যে সুন্দর ছিলেন দাদা।

দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যায়। তারপর মুহিবই মুখ খুলে-

- তবে তুই একজন মুক্তিযোদ্ধার অটোগ্রাফ নিতে পারিস। আমার দাদার বন্ধু ছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন।

- কোথায় আছেন?

- কাছেই। বাসে গেলে আধা ঘণ্টা লাগবে।

- চল যাই

- আজই যাবি?

- হ্যাঁ আজই। আমি খাতা নিয়ে আসি এক দৌড়ে।

- যা নিয়ে আয়। বাস ভাড়া আনিস কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই।

- আনব আনব।

দুজনে বাস থেকে নামল একটা ঘিঞ্জি বাজারের মোড়ে। সেখানে একটা চায়ের টং দোকান। একজন বেশ বৃদ্ধ মানুষ চা বানাচ্ছেন। মাথায় চুল নেই কিন্তু মুখ ভর্তি ধবধবে সাদা দাড়ি গোঁফ।

- ইনি। ফিসফিস করে মুহিব।

- ইনি মুক্তিযোদ্ধা? চা বানাচ্ছেন?

- হ্যাঁ ইনিই। দাদার বন্ধু একসঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তাঁরা। বুড়ো মানুষটা হঠাৎ ওদের খেয়াল করেন। মুহিতকে দেখে তাঁর মুখটা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠে-

- কি নাতি কী খবর তোমার?

- জি ভালো। আমার বন্ধু এসেছে আপনার সাথে কথা বলতে।

- তোমার বন্ধু ? নাম কী?

- জি রন্টু।

- বা বা তাহলে তো অনেক বড়ো মেহমান আমার।

- আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি। সাহস করে বলে রন্টু। তার বুকটা ধরফর করছে। একজন সত্যি মুক্তিযোদ্ধাকে দেখছে সে এই প্রথম সামনাসামনি।

- কী কাজ? বুড়ো মানুষটার মুখে কৌতুকের হাসি।

রন্টু খাতাটা বের করে। 'এই খাতায় আপনি একটা অটোগ্রাফ দিবেন'।

বুড়ো মানুষটা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল ' কিন্তু বাবা আমি তো লেখাপড়া জানি না। তবে চিন্তা নাই তোমার খাতায় টিপসই দিতে পারব। কিন্তু কালি তো নাই। দাঁড়াও একটা বুদ্ধি করি। ' বলে লোকটা তাঁর চায়ের কেতলির গায়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা ঘষা দেয়।

- আনো তোমার খাতাটা আনো। রন্টু খাতাটা এগিয়ে দেয়। তিনি টিপসই দেন। তারপর ফিসফিস করে বলেন। ' সেই ৭১ সালের এপ্রিল মাসে আমি আর ওর দাদা রেজওয়ান ভাই দুইজনে যুদ্ধে নাম লেখাই। রেজওয়ান ভাই সাইন করে আর আমি মুখ্য সুখ্য মানুষ টিপসই দেই। আর এত বছর পর তোমার খাতায় আবার দিলাম' বলে হো হো করে হাসেন তিনি। তাঁর হাসিটা অনেক সুন্দর।

ফেরার পথে মুহিব বলে । ‘বুঝলি এই দাদুটা যুদ্ধ থেকে ফেরার পর প্রথম আমার দাদির কাছে দাদার শহিদ হওয়ার খবরটা নিয়ে আসে। তারপর নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখে তাঁর কেউ বেঁচে নেই। এরপর থেকে উনি এইখানে এভাবেই আছেন। উনি যে লেখাপড়া জানেন না এটা জানতাম না, উনি নাকি মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেটও নেননি।’

ফেরার পথে দুজনের কেউ কোনো কথা বলে না। ফাঁকা বাসটায় পাশাপাশি সিটে চুপচাপ বসে থাকে।

- কেমন লাগলরে আমার দাদার বন্ধুকে? মুহিব জিজ্ঞেস করে।

- খুব ভালো লেগেছে। উনার সাথে একটা ছবি তুলতে পারলে ভালো হত তাই না?

- ঠিক বলেছিস। এর পরের বার আপুর ফ্রেন্ডকে নিয়ে আসব।

- হ্যাঁ তাই করতে হবে।

- এরপর কার অটোগ্রাফ নিবি? মুহিব জিজ্ঞেস করে রন্টুকে।

- কারো না।

- মানে? আর কারো অটোগ্রাফ নিবি না?

- না।

- কেন?

- এই একটা অটোগ্রাফই থাকবে আমার অটোগ্রাফের খাতায়। ফিসফিস করে বলে রন্টু।।

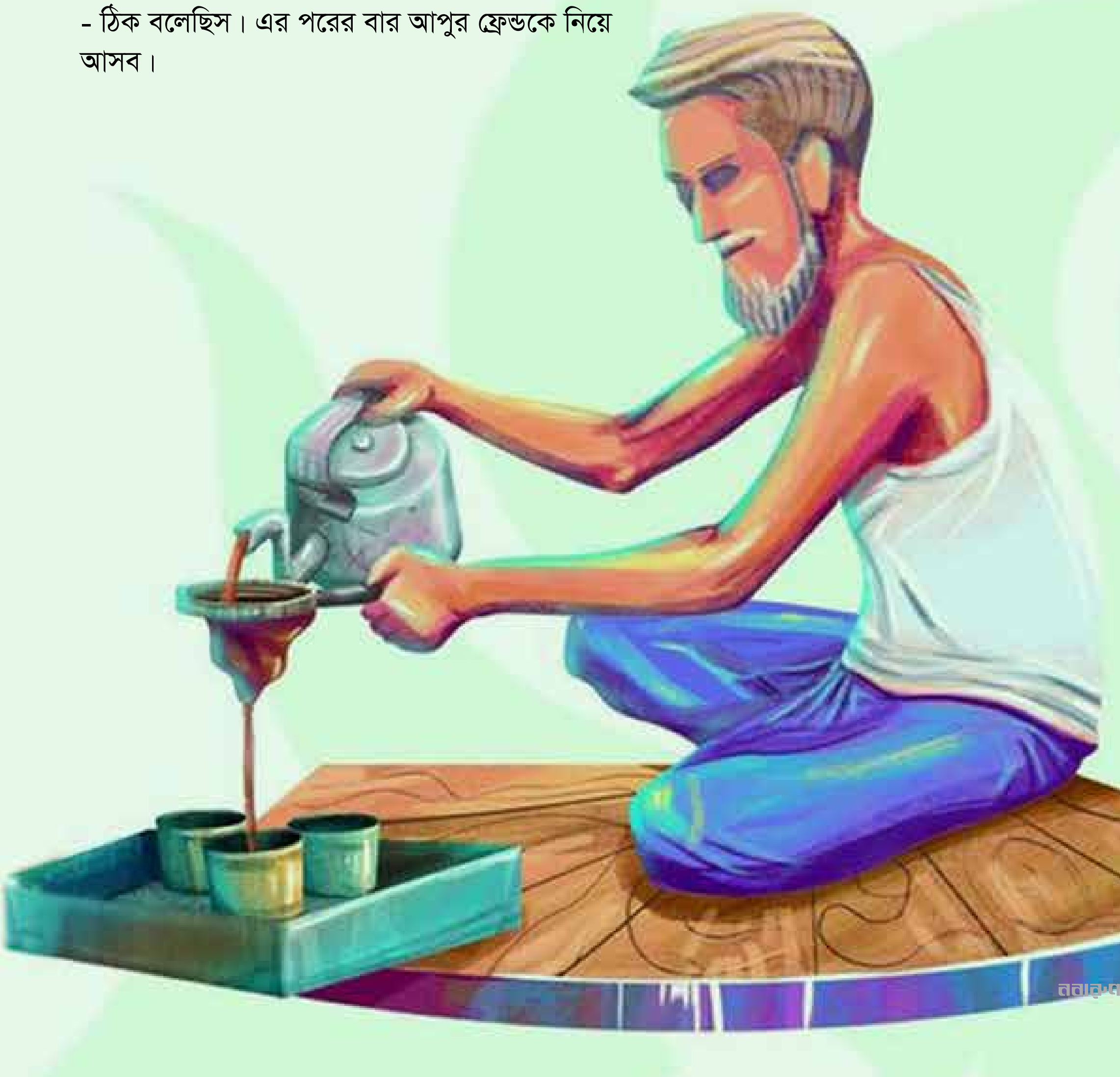

আমীরুল ইসলাম

যখন ছয় দফা ঘোষণা করা হয়েছে তখন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁরা ক্ষমতায় যাবেন। বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায় করবেন। তখন আয়ুব খানের শাসনামল। তার সম্পর্কে রটনা আছে তিনি লৌহমানব, শোষণ আর নির্যাতনের প্রতীক। সেই আয়ুব খানের বিরুদ্ধে বারবার আন্দোলন করছেন। জেলে যাচ্ছেন। জনগণের গভীর ভালোবাসা, বাংলার মানুষের মনের কথা তিনি বলছেন।

তিনি বাংলার নেতা, বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনৈতিক জীবন যাঁর, জেল-জুলুম আর আন্দোলন করে তাঁর ব্যস্ত সময়। তাঁর জীবনে ছুটি নেই। অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তিনি। দিনের পর দিন বাংলার পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অতি পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে যেত। ওজন কমে যেত। কিন্তু মানুষের ভালোবাসাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না। পুরো জীবনে ব্যস্ততা তাঁর কখনো কমেনি। শুধু জেলখানায় গেলে তাঁর বিশ্রাম মিলত।

কিন্তু মহান নেতাদের বিশ্রাম বলে কিছু নেই। বঙ্গবন্ধু জেলখানায় গেলে বই পড়তেন। স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছার অনুরোধে দিনলিপি লিখতেন। জেলের বন্দিদের সঙ্গে জেলের ভেতরেই নতুন কিছু করার পরিকল্পনা করতেন। এক আশ্চর্য মানুষ তিনি। দয়ার সাগর, ভালোবাসার সমুদ্র তিনি। তাঁকে নিয়ে কী গল্প লেখা যায়? গল্পেরও ঊর্ধ্বে তিনি। বাংলাদেশ জুড়ে তখন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পাকিস্তান সরকার তখন রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করছে। এর বিরুদ্ধে ফেটে পড়ছেন শিক্ষক, ছাত্র, শিল্পী- লেখকেরা। প্রতিবাদে সংগঠিত হচ্ছে সবাই। গঠিত হচ্ছে রবীন্দ্রচর্চার জন্য ছায়ানট।

পয়লা বৈশাখকে বলা হচ্ছে বিজাতীয় সংস্কৃতি। দেশ জুড়ে তখন আরও ব্যাপক হারে পয়লা বৈশাখ উদযাপনের আয়োজন। অনেক প্রগতিশীল শিশু-কিশোর সংগঠন কাজ করছে। তাদের চোখেও নতুন দিনের স্বপ্ন। তারাও দীক্ষিত বাঙালি মন্ত্রে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে তখন অনেক সংগঠন। বাঙালি জেগে উঠেছে। জাগরণের মন্ত্র তখন শোনা যাচ্ছে চারদিকে। ছায়ানট, ক্রান্তি সংসদ, উদীচী, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, নাট্য দল, শিশু সংগঠন তারা প্রতিবাদমুখর। অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদ।

ষাট দশকে উত্তাল বাংলাদেশ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তখন নতুন কিছু হচ্ছে। শোনা যায় চারদিকে নতুনের সুর। বাষট্টিতে ছাত্র আন্দোলন। ছেষট্টিতে ছয় দফা। উনসত্তরে গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরে নির্বাচন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের স্বাধীনতা।

সে আরেক গল্প।

ষাট দশকের মধ্যভাগ। নিরিবিলি শান্তশিষ্ট ঢাকা শহর। মনোরম সবুজে ঢাকা। শহর জুড়ে অনেক পুকুর। ফল ও ফুলের বাগান।

আজকের মতো বিস্তৃত নয় ঢাকা। বুড়িগঙ্গার তীরে পুরানো ঢাকা। মতিঝিল, আজিমপুর তৈরি হচ্ছে। ধানমন্ডি, বনানী, গুলশান ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। মাত্র বসতি গড়ে উঠছে। বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। তখন

মিছিল, মিটিং হতো পল্টনে। এখন যেটা আউটার স্টেডিয়াম। রেসকোর্স ময়দানে কিছু কিছু মিটিং হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেও ছাত্রদের মিটিং।

নবাবপুর তখন কর্মব্যস্ত এলাকা। নবাবপুরের শেষ মাথায় আওয়ামী লীগের অফিস। তখন যানজট নেই এই শহরে। অল্পকিছু বাস আর মোটরগাড়ি চলে। রিকশার শহর তখন ঢাকা। বাক্সের মতো পর্দায় ঢাকা ঘোড়ার গাড়িও চলে পুরানো ঢাকায়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর গাড়িতে চড়ে তোপখানা হয়ে নবাবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলেন নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামান। প্রেসক্লাবের সামনে এসে গাড়ি থেমে গেল। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। ব্যাপার কী?

বঙ্গবন্ধু গাড়ি থেকে নামলেন। একদল ছেলে-মেয়ে দৌড়ে এল তাঁর কাছে।

কিরে কী হয়েছে তোদের?

আমরা সবাই কচিকাঁচার মেলা করি। আমাদের শিক্ষা শিবিরে আপনাকে যেতে হবে।

বঙ্গবন্ধু এবার হো হো করে হাসলেন।

আমি তো বুড়ো মানুষ। আমি তো তোমাদের মতো শিক্ষিত নই। আমি রাজনীতি করি। তোমাদের ওই সুন্দর মিলনমেলায় আমি বড়ো বেমানান।

শিশু-কিশোরের দল তাঁকে ধরে হইচই করে প্রেসক্লাবের ভেতরে নিয়ে গেল। তখন লাল ইটের পুরোনো প্রেসক্লাব। পেছনে বিশাল মাঠ। সেখানে চলছে দু-দিনব্যাপী শিক্ষা শিবির। নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন। নাচ, গান, নাটক পরিবেশনা ছাড়াও লাঠির লড়াই, দৌড়ঝাঁপ নানাকিছুর আয়োজন। সারা দেশ থেকে অভিভাবকদের সাথে নিয়ে ছেলে-মেয়ের দল এসেছে।

বঙ্গবন্ধু ছোটোদের সাথে পা মিলিয়ে ধীরে ধীরে প্রেসক্লাবের ভেতরে প্রবেশ করলেন। আজ ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় এই শিক্ষা শিবিরের কথা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু জানেন তাঁর গুরুজন, তাঁর দীক্ষাদাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও কচিকাঁচার মেলার সঙ্গে জড়িত। ছুটির দিন ইত্তেফাকে দুই পাতা কচিকাঁচার আসর প্রকাশিত হয়। সারা দেশের মেলার খবর পাওয়া যায় সেই পাতায়। বঙ্গবন্ধু হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইলেন,

কবি সুফিয়া কামাল আছেন কি না।

আবদুল্লাহ আল মূতি কোথায়? শিল্পী জয়নুল আবেদীন কি এর মধ্যে এসেছিলেন? তোমরা দেখেছ তাঁকে? আর দাদাভাই? কেমন আছেন তিনি। তোমাদের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করে দিলেন।

শিশুরা খুবই আন্তরিক। বিজ্ঞের মতো উত্তর দিচ্ছে।

সুফিয়া খালা দুপুর পর্যন্ত ছিলেন। সন্ধ্যায় আবার আসবেন।

একজন বলল,

জয়নুল আবেদীন স্যার তাদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেছেন। তাঁকে একটা ছবি এঁকে অটোগ্রাফ দিয়েছেন।

আরেকজন বলল,

দাদাভাই খুব ব্যস্ত। শত শত ছেলে-মেয়ের আজ রাতে ক্যাম্পফায়ার আছে। তারই ব্যবস্থা করছেন তিনি।

এইসব শুনতে শুনতে ততক্ষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছোট্ট মঞ্চটার সামনে। পাশে লাঠিখেলার মহড়া হচ্ছে। দাদাভাই ছুটে এলেন।

মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ভিড় জমে উঠল।

দাদাভাই বললেন,

লিডার থাকেন, আমাদের সাথে আজ। ভালো লাগবে।

বঙ্গবন্ধু চশমার ফাঁকে মিষ্টি করে হাসলেন।

দাদাভাই শিশুদের মাঝেই তো থাকতে চাই। আমাদের তো করার আর কিছুই নেই। ওদের যদি ঠিকমতো বাঙালি বানানো যায় তবে বাংলাদেশ পেতে আমাদের দেরি হবে না।

ততক্ষণে শিমুল ইউসুফ নামের একজন শিশুশিল্পী ছুটে এসেছে নেতার কাছে। আমি একটা গান শোনাতে চাই। বঙ্গবন্ধু খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে খোলা গলায় শিমুলের কণ্ঠে গান শুনলেন। 'আমার সোনার বাংলা

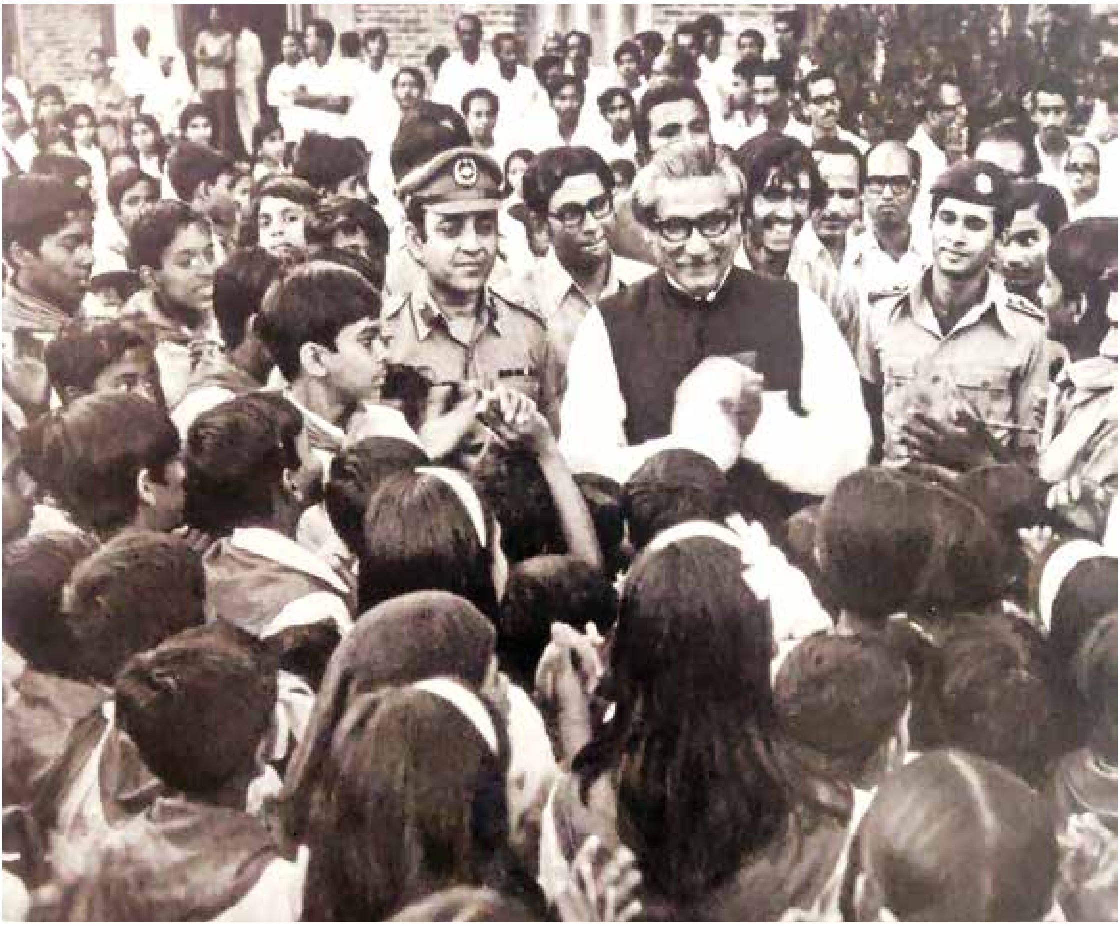

আমি তোমায় ভালোবাসি।' বঙ্গবন্ধুর বড়ো প্রিয় গান। বিজ্ঞানী আবদুল্লাহ আল মূতি কাঁচুমাচু হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মূতি সাহেবের দিকে তাকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন,

লেফট-রাইট করে আর কিছু হবে না। লেফট-রাইটের বিরুদ্ধে আমি। ওই যে ওরা ব্রতচারি শিখছে ওটাই আসল বাঙালিয়ানা। ওটাই করা উচিত। রাজনীতি করেই আমার জীবনটা কাটল। সময় থাকলে আপনাদের সাথে দুটো দিন কাটালে কিছু শেখা যেত।

ছোটোরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। দাদাভাইকে কানে কানে বললেন,

কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। কচিকাঁচার মেলা খুব ভালো কাজ করছে। আমি মেলার সাথে আছি। দাদাভাই বিনয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

দেশটা আগে স্বাধীন করে নেই দাদাভাই। সব হবে। আমাদের সব হবে।

আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু গেলেন আওয়ামী লীগ অফিসে। তাঁদের জরুরি মিটিং আছে। কিন্তু ছোটোদের তিনি ভোলেননি। সন্ধ্যাবেলায় বিপুল পরিমাণ মিষ্টি পাঠিয়ে দিলেন কচিকাঁচাদের ক্যাম্পে। সেই মিষ্টি পেয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল কচিকাঁচাদের মধ্যে।

দুই

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। জন্মদিনে তিনি কোনো উৎসব করতেন না।

কাছের মানুষদের বলতেন,

পরাধীন দেশে আমার আবার জন্মদিন কী রে? যে

দেশের অভাবি মানুষেরা পেট ভরে ভাত খেতে পায় না। সে দেশে জন্মদিন পালন করা কৌতুকের ব্যাপার।

স্বাধীন বাংলাদেশে অবশ্য বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন করা হতো গণভবনে। সেখানে উপস্থিত হতো শত শত শিশু-কিশোর। তারা সবাই শিশু-কিশোর সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। বয়স্কাউট, গার্লস গাইডস, কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, মুকুল ফৌজ এরকম নামকরা সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশ থেকে ছেলে-মেয়েরা আসত। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতো-

১৯৭৫ সাল।

১৭ই মার্চ। গণভবনের খোলা মাঠে ছেলে-মেয়েদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। কোনো জাঁকজমক নেই। ছোট্ট একটা মঞ্চ। ছোটোরা আপন খেয়ালে গান গাইছে। ছড়া- কবিতা পাঠ করছে। একাধারে কয়েকজন ছবি আঁকছে। সবই বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে।

বঙ্গবন্ধু শিশুদের মধ্যে এসে হারিয়ে গেলেন। তিনি ওদের সঙ্গে গল্প জুড়লেন। ওদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

রাতুল বলল,

বঙ্গবন্ধু আপনি বাংলাদেশে ছোটোদের জন্য কী করবেন?

তোমরা যা চাইবে সব হবে। সব করব। প্রত্যেক স্কুলে খেলার মাঠ থাকবে। আগে স্বাস্থ্য ঠিক করতে হবে। একটা প্ল্যাটফর্ম বানাবো। যেখানে শিশুদের নিয়ে কাজ করা হবে।

লিটন দূর থেকে চিৎকার করে বলল,

বঙ্গবন্ধু ছোটোদের জন্য একটা রেডিও স্টেশন চাই। একটা পত্রিকা চাই।

বাহ ভালো প্রশ্ন করেছ ভাই। আমাদের পরিকল্পনায় আছে এসব।

মিতুল নামের পুতুল পুতুল মেয়েটা মৃদুস্বরে বলল,

আমাদের মেলার কোনো নিজস্ব ভবন নেই।

তাই নাকি? এটা খুব দুঃখজনক।

সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু কোনো এক সচিবকে ডাক দিলেন। বললেন,

শিশু সংগঠনগুলোর নিজস্ব ভবন থাকবে না এটা হতে পারে না। নোট রাখো। পরে আমাকে মনে করিয়ে দেবে।

একটা পিচ্চি বলল,

আমি একটা গান শোনাবো তোমাকে।

দীর্ঘদেহী বঙ্গবন্ধু ঝুঁকলেন শিশুটির দিকে।

কী গান গাইবে তুমি?

আমাদের জাতীয় সংগীত।

গাও গাও। আমিও গাইব তোমাদের সাথে।

সবাই মিলে গানটা গাওয়া হলো। কেক কাটা হলো।

বঙ্গবন্ধু বললেন,

বন্ধুরা তোমরা আজ স্বাধীন। এই খোলা মাঠে হইচই করো, নাচো, গান গাও। আর পেট ভরে খাও-দাও। আমার অনেক কাজ। অনেক দায়িত্ব। আমি বিদায় নিচ্ছি।

আজ তাই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। এটি ঘোষণা করেছেন মহান নেতার যোগ্য কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিন

ছোটোদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা চলছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে। আজ জাতীয় শিশু দিবস। শিশু একাডেমি জুড়ে বড়ো বড়ো ফেস্টুন। বঙ্গবন্ধু এবং রাসেল, অমলিন হাসি। কোনো ছবিতে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় কন্যা শেখ হাসিনাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। অসাধারণ ছবি। পিতা-কন্যার এমন জীবন্ত ছবি কী আর আছে?

শিশু একাডেমির মাঠে লাল সবুজ পোশাক পরা শত শত ছেলে-মেয়ে। তারা আজ ছবি আঁকবে। বঙ্গবন্ধুর ছবি। সবার সামনে বড়ো বড়ো কাগজ। রংতুলি। কিন্তু সামনে বঙ্গবন্ধুর কোনো ছবি নেই।

সকালে র‍্যালি হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও এসেছিল র‍্যালিতে। নানা সংগঠনের ছেলে-মেয়েরা ছিল। তাদের হাতে সুন্দর সুন্দর পোস্টার।

আমরা সুন্দর হবো। শিশুর মুখে হাসি চাই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে চাই। আমরা দেশকে ভালোবাসি। হৃদয়ে বাংলাদেশ। লাল-সবুজের বাংলাদেশ। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর স্লোগান। র‌্যালি হয়েছে সকালে।

শিশু একাডেমির গেট থেকে শুরু হয়ে র‌্যালি এগিয়ে গেছে হাইকোর্ট হয়ে প্রেসক্লাব পর্যন্ত। তারপর প্রতিটা ছেলে-মেয়েকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। দুপুরে দেওয়া হয় কাচ্চি বিরিয়ানি। আজ জাতীয় শিশু দিবস। প্রত্যেকের মনে খুশির উতলা হাওয়া।

বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাঝখানে ছবি আঁকা। ছোটোরা গোল হয়ে আছে। শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার, শিল্পী হাশেম খান আর শিল্পী রফিকুন নবী বিচারক। হাশেম খান অবশ্য ঘুরে ঘুরে সব ছবি দেখছেন। সারাজীবন তিনি ছোটোদের আঁকা ছবির খুব ভক্ত। গভীর মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো প্রত্যক্ষ করেন। তারপর তিনি ছবি বাছাই করেন। গভীর নিষ্ঠার সাথে তিনি এসব করেন। শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার উদাসীন ব্যক্তি। নিমগ্ন থাকেন সবসময়। শিল্পের সব শাখায় তিনি পারঙ্গম। গান বোঝেন। গান গাইতে পারেন। নৃত্য বোঝেন খুব উচ্চস্তরে। সেট ডিজাইনের সেরা শিল্পী। জাদুকরের মতো কথা বলেন।

তিনি পান চিবুতে চিবুতে ছোটোদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ এক শিশু শিল্পীর সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

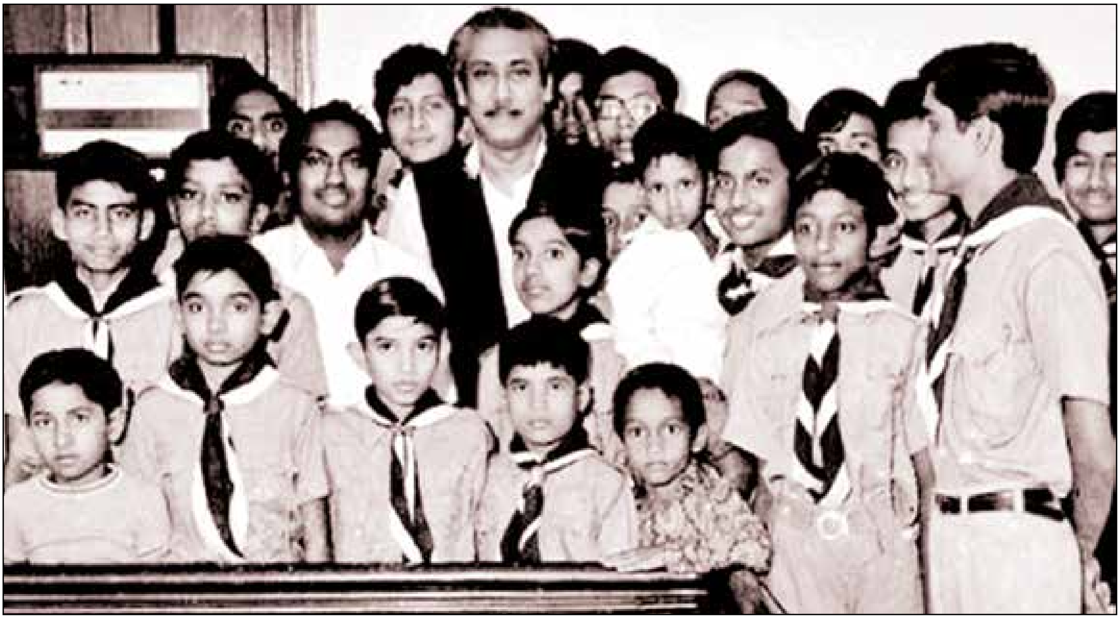

শিশু একাডেমির পরিচালক আনজীর লিটন খুব ব্যস্ত। তিনি ছোটাছুটি করছেন।

আজ জাতীয় শিশু দিবস। আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন।

টেলিভিশনের ক্যামেরা এসেছে। তারা বাচ্চাদের ছবি তুলছে। তারা যে ছবি আঁকছে সে সবের ভিডিও।

রফিকুন নবী বাচ্চাদের মধ্যে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর মতে, ছোটোরা যা আঁকে তাই শ্রেষ্ঠ। তাই ওদের ছবির বিচার করে লাভ নেই। সবাইকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।

বাহ তুমি তো ছবিটা খুব সুন্দর এঁকেছ। তর্জনী তুলে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের বক্তৃতা দিচ্ছেন। ছবিটা কি তুমি দেখে দেখে এঁকেছ?

মেয়েটি হাসল।

না স্যার, মনের থেকে এঁকেছি।

হ্যাঁ। সেই ছবিই সবচেয়ে সুন্দর যা মনের রং দিয়ে আঁকা হয়।

আর জানো তো বঙ্গবন্ধুর ছবি কিন্তু আমাদের মনের মধ্যেই থাকে। ছবি দেখে আঁকার দরকার পড়ে না।

চোখ বন্ধ করলেই আমরা তাঁকে দেখতে পাই। তাই না?

জি স্যার।

মুস্তাফা মনোয়ার খেয়াল করলেন কারো সামনে বঙ্গবন্ধুর কোনো ছবি নেই। কিন্তু প্রত্যেকে মন থেকে ছকি এঁকে ফেলছে। নানা ধরনের ছবি। যেমন বঙ্গবন্ধু পায়রা ওড়াচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিচ্ছেন। কেউ এঁকেছে বঙ্গবন্ধু শেখ রাসেলের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন। কেউ এঁকেছে পাইপ হাতে বঙ্গবন্ধু। কেউ এঁকেছে ঘরের ভেতরে আটপৌরে বঙ্গবন্ধু। কারো ছবিতে বঙ্গবন্ধু প্রাণখুলে হাসছেন। কারো ছবিতে কপালে হাত রেখে বঙ্গবন্ধু চিন্তিত।

মুস্তাফা মনোয়ার ওদের আঁকা ছবি দেখেন আর খুশিতে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। শিল্পীরা বললেন কাউকে প্রথম, দ্বিতীয় করা হবে না। আজ সবাই প্রথম হয়েছে।

পরিচালক আনজীর লিটন ঘোষণা দিলেন, ওদের আঁকা ছবি নিয়ে একটা বড়ো আকারের প্রদর্শনী হবে। সবাই খুশি, আনন্দে তারা তালি দিতে লাগল।

পরিচালক আনজীর লিটন আরও বললেন, ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের আঁকা ছবি নিয়ে সুন্দর একটা বই প্রকাশ করা হবে।

আর হাশেম খান বললেন,

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা ছবি এঁকে প্রমাণ করলে যে বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে আছেন। তাঁর মৃত্যু নেই। আমরা সবসময় বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরে এগিয়ে যাবো।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

ছোটোরাও স্লোগান দিতে লাগল। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। ❑

শিশুসাহিত্যিক

অগ্নিবীরের বহ্নিগাথা

মিয়াজান কবীর

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
দেশ মাতৃকার ভক্ত,
দেশের তরে দিয়ে গেলো
বুকের তাজা রক্ত।

অগ্নিবীরের বহ্নিগাথা
রক্তে লেখা ছত্রে।
তাদের কথা লেখা হলো
ইতিহাসের পত্রে।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই শিশু অধিকার আইন

মাহবুব রেজা

শিশু হও, শিশুর মতো হও। শিশুর মতো হাসতে শেখো- দুনিয়ার সব ভালোবাসা পাবে-বঙ্গবন্ধু প্রায় সময়ই একথা বলতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিশুদের মধ্যে বাস করে অমিত সম্ভাবনার বীজ- তাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আগামীর স্বপ্ন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, পৃথিবীতে শিশুদের চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই। একজন শিশুকে যদি সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাহলে সে পরিণত হবে শক্তিতে। একজন সুনাগরিক দেশের জন্য, সমাজের জন্য করতে পারে না এমন কিছুই নেই।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুকে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার এক দুঃসাধ্য কঠিন যুদ্ধে একাই নামতে হয়েছিল। তিনি তখন নানামুখী চাপের মধ্যেও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে কিছু কাজ করে যেতেই হবে। যেসব কাজ করলে তাঁর নিজস্বতা দিয়ে, সম্পদ দিয়ে বাংলাদেশ একদিন পৃথিবীর বুকে গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সেই বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সেসব উদ্যোগের মধ্যে শিশুদের নিয়ে পরিকল্পিত ভাবনা ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের জন্য একটি আইন প্রণয়ন

করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশুদের সুরক্ষা, তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে শিশু অধিকার আইনের প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দূরদর্শী নেতা বলেই এই আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে যা যা করার তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে শিশুরা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাবে। যদি রাষ্ট্র ও সমাজ শিশুকে তার প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে সেই শিশু পিছিয়ে থাকবে না। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন শিশুকে যদি অধিকার, দেশপ্রেম, নীতি নৈতিকতা, ভালোবাসা আর নিরাপত্তা দিয়ে ছোটোবেলা থেকে বড়ো করে তোলা যায় তাহলে সে তার দেশের জন্য সম্পদে পরিণত হবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সমাজের কাছে, দেশের কাছে তার প্রাপ্য অধিকার পেয়ে শিশু যদি শিক্ষাদীক্ষায় বড়ো হয়ে উঠতে পারে তাহলে একজন নাগরিক হিসেবে সে কখনোই তার মানুষের সাথে, তার জন্মভূমির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধুর সে বিশ্বাস আজ সত্যিতে পরিণত হয়েছে। শিশুদের জন্য তিনি একটি বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বুকের সবটুকু দিয়ে শিশুদের ভালোবাসতে জানতেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু কত বড়ো দূরদর্শী নেতা ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর শিশু আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়েই। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন ১৯৭৪ সালে।

দুই

শৈশব থেকেই বঙ্গবন্ধু শিশুদের প্রতি আন্তরিক ছিলেন। তাদের বিষয়ে ছিলেন উদার। খুব সহজে শিশুদের সাথে মিশে যাওয়ার প্রবণতা ছিল তাঁর। ছোটোবেলা থেকেই তিনি খুব মিশুক ছিলেন। শিশুদের সঙ্গে মিশে তিনি একেবারে শিশুদের মতো হয়ে যেতেন।

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই ভালোবাসা বিভিন্ন স্মৃতিকথায় খুঁজে পাওয়া যায়।

ক. ১৯৬৩ সালে তোপখানার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী এক শিশুমেলা উদ্‌বোধন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশি মনটাকে একটু হালকা করার জন্য।

আর একথা কে না জানে বঙ্গবন্ধু শিশুবেলা থেকেই অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, তাঁর বুকের ভেতরটা ভরা থাকত মানুষের জন্য ভালোবাসায়। সারাজীবন তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন বাংলা আর বাঙালির জন্য তিনি সবকিছু করতে পারেন। পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন অফুরান ভালোবাসা, মমতা আর আদর্শ। গোপালগঞ্জের ছায়া সুনিবিড় টুঙ্গিপাড়ার অপরূপ সবুজ প্রকৃতি তাঁর মধ্যে উদারতা আর মানবিক হওয়ার গুণাবলি দিয়েছিল, ফলে তিনি সারাজীবন শিশুদের মতো থাকতে পেরেছিলেন।

খ. খুব সাধারণ একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ না করলেই নয়।

১৯৭২ সালের কোনো এক সকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর বড়ো ছেলে শেখ কামালকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছেন। হাঁটতে হাঁটতে বঙ্গবন্ধু লক্ষ্য করলেন, একটি ছোটো ছেলে কাঁধে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ছেলেটির পায়ে কালো রঙের জুতো। বিষয়টি তিনি খুব ভালো করে খেয়াল করলেন।

একটা সময় তিনি ছেলেটিকে কাছে ডেকে নিলেন। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি উত্তর করল, তার পা ব্যথা করছে।

এবার বঙ্গবন্ধু ছেলেটির জুতা খুলে দেখতে পেলেন, ছেলেটির জুতার নিচ থেকে পেরেকের চিকন মাথা বেরিয়ে আছে আর তা থেকে ছেলেটির পা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ফলে তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এরপর বঙ্গবন্ধু দ্রুত তাঁর লোকদের ডেকে ছেলেটির ব্যাপারে যা যা করণীয় তা করার নির্দেশ দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এরকম ব্যবহারে ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

বঙ্গবন্ধু ছেলেটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন।

তিন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। তিনিও পিতার মতো চান এদেশের শিশুরা তাদের শতভাগ অধিকার নিয়ে বেড়ে উঠুক। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে- সুতরাং শিশুদেরকে সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করলে তারা দেশকে, সমাজকে তার যথাযথ প্রতিদান ফিরিয়ে দেবে। আর এর ফলে দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে- বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবন এটাই চেয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনাম আছে তিনি শিশু অন্তপ্রাণ- বাবার গুণে গুণান্বিত হয়েছেন তিনি। অত্যন্ত শিশুবান্ধব বলে পরিচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, নিজের শৈশবের মজার মজার স্মৃতিকথা লিখেছেন শিশু-কিশোরদের জন্য, যাতে এদেশের শিশুরা আগামী দিনে সুন্দরভাবে বড়ো হয়ে উঠতে পারে। তাঁর বিখ্যাত বই, 'ওরা টোকাই কেন' গ্রন্থে তিনি বারবার এদেশের অবহেলিত, শিক্ষা-অধিকার বঞ্চিত শিশুদের কথা পরম ভালোবাসায় লিখেছেন- এ বই পড়ে দেশের হাজার হাজার শিশু-কিশোর আগামী দিনে তাদের দায়িত্ব কী, করণীয় কী তা বুঝতে শিখেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর অপরাপর সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর একক নির্দেশে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে সমাজের অবহেলিত, অতি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ছিন্নমূল শিশুদের জন্য নেওয়া হয়েছে কার্যকর অনেক পদক্ষেপ। এসব পদক্ষেপের বাস্তবায়ন, প্রয়োগ সবকিছুই তিনি নিজে মনিটরিং করছেন। তিনি চান ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে শুরু করে সব ধরনের শিশুশ্রম এদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে কমিয়ে এনে তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে তিনি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রায় অবশ্য ২০৩০ নয়, ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্য রয়েছে। এসব বাস্তবায়ন করার জন্য ২০১০ সালের শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার আলোকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে বঙ্গবন্ধুকন্যা চান, ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

গবেষণায় দেখা যায়, বর্তমানে দেশের ১২ লাখ ৮০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। সরকারের লক্ষ্য এসব শিশুকে নানা কর্মসূচির আওতায় তাদের সেখান থেকে এনে অন্যত্র পুনর্বাসন করা। প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের কঠোর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে সরিয়ে আনা শিশুরা যেন আর কখনোই পুরনো জায়গায় ফিরে না যায়, সেজন্য তাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ কর্মীর হাতে পরিণত করা হয়।

চার

শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ১৯২৪ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'শিশু অধিকার' ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। বাংলাদেশও পরবর্তীতে এই সনদে স্বাক্ষর করে।

শিশু অধিকার সনদে ৫৪টি ধারা এবং ১৩৭টি উপ-ধারা আছে। এই উপ-ধারাগুলোতে বলা হয়েছে, শিশুদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না।

সরকার দেশের প্রতিটি শিশুর ব্যাপারে আন্তরিক। শিশুদের মৌলিক অধিকার অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। দেশের শিশুরা যাতে এসব সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

পাঁচ

এই ইতিহাস ভুলে যাবো আজ
আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম
শেখ মুজিবুর রহমান।

কবি সৈয়দ শামসুল হক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লিখতে গিয়ে কবিতায় এভাবেই উচ্চারণ করেছেন বাংলার সাধারণ মানুষের মনের অব্যক্ত কথাটি। বঙ্গবন্ধু এদেশে না জন্মালে বাঙালি স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারত না। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন তাই এক অনাবিল আনন্দের দিন, শান্তির দিন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার এসে তাঁর জন্মদিনকে আগামী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর থেকে প্রতি বছর এদিনটিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

পিতার দেখানো পথে হাঁটছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতার মতো তিনিও শিশুদের যে-কোনো বিপদে-আপদে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ শিশুদের যে-কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। পিতার মতো কন্যাও বিশ্বাস করেন, দেশের প্রতিটি শিশুকে যদি উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষায় সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় তাহলে বাংলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দেশের প্রতিটি শিশুর মাঝে তিনি খুঁজে পান আগামীর সম্ভাবনাময় বাংলাদেশকে। ❑

শিশুসাহিত্যিক ও
সাংবাদিক, ৭১ টেলিশিশন

ভোলা এবং টুকুন সোনা

নাসরীন মুস্তাফা

সে কীভাবে এই শহরে এসেছিল কে জানে! অথবা হয়ত এখানেই জন্ম হয়েছে ওর। আর সব কুকুরের মতো মায়ের পেট থেকে অন্য ভাই-বোনদের সাথে একসাথেই বেরিয়েছিল। ছোট্ট শরীর। ধোঁয়া রঙা সকলের নেড়া পেট। ছোট্ট একটু লেজ কাঁপছে। কিলবিল করছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। কেঁউ কেঁউ করছে। কী যেন কী বলছিল মা'কে! ফোস ফোস, চুকচুক করে মায়ের বুকের দুধ খেয়ে খুব আরামে তাকাচ্ছিল চারদিক।

তাকাচ্ছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিল না। কেননা, সব কুকুরছানার মতো এরাও জন্মেছিল অন্ধ হয়েই। ঠিক সময়ে সবকটা শাবকেরই চোখ ফুটল। খুব আনন্দে তারা তাকিয়ে দেখছিল চারদিক। ভাবছিল, মায়ের পেটের চাইতেও বড়ো জায়গা তাহলে আছে!

সেও চোখ মেলল। কিন্তু আলো দেখার ভাগ্য তার ছিল না। ছাই রঙের পুরো পর্দায় ঢাকা ছিল তার দু'চোখ। অন্ধ ছিল সে।

তার মা ছেলে-মেয়েগুলোকে যতদিন দেখে রাখা দরকার, দেখে নিজের পথ খুঁজে নিল। ভাইবোনরাও ততদিনে স্বাবলম্বী। অন্ধ হয়েও টিকে গেল সে। যদিও সে জানত না যে সে অন্ধ। জানার উপায়টাই বা কী? সে ভেবেছে, এই বুঝি ঘটে সবসময়। ভালো দৌড়াতে পারত না সে। শক্ত সামর্থ্য পাগুলো কোথায় ফেলবে এই ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকত সবসময়। নোংরা ছিল সে। প্রায়ই অসুখে ভুগত। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত আর আবর্জনায় নাক গুঁজে বেড়াতো। অন্য সব হাঘরে ক্ষুধার্ত কুকুরদের সাথে একত্রে পেতো লাথি-ঝাঁটা, লাঠির বাড়ি আর ময়লা পানির ধারা। প্রায়ই মারামারি বাধত অন্য কুকুরদের সঙ্গে। নিশ্বাসের শব্দ আর গর্জন লক্ষ্য করে লাফ দিত সে। প্রায়ই ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দিত শুধু শূন্যে।

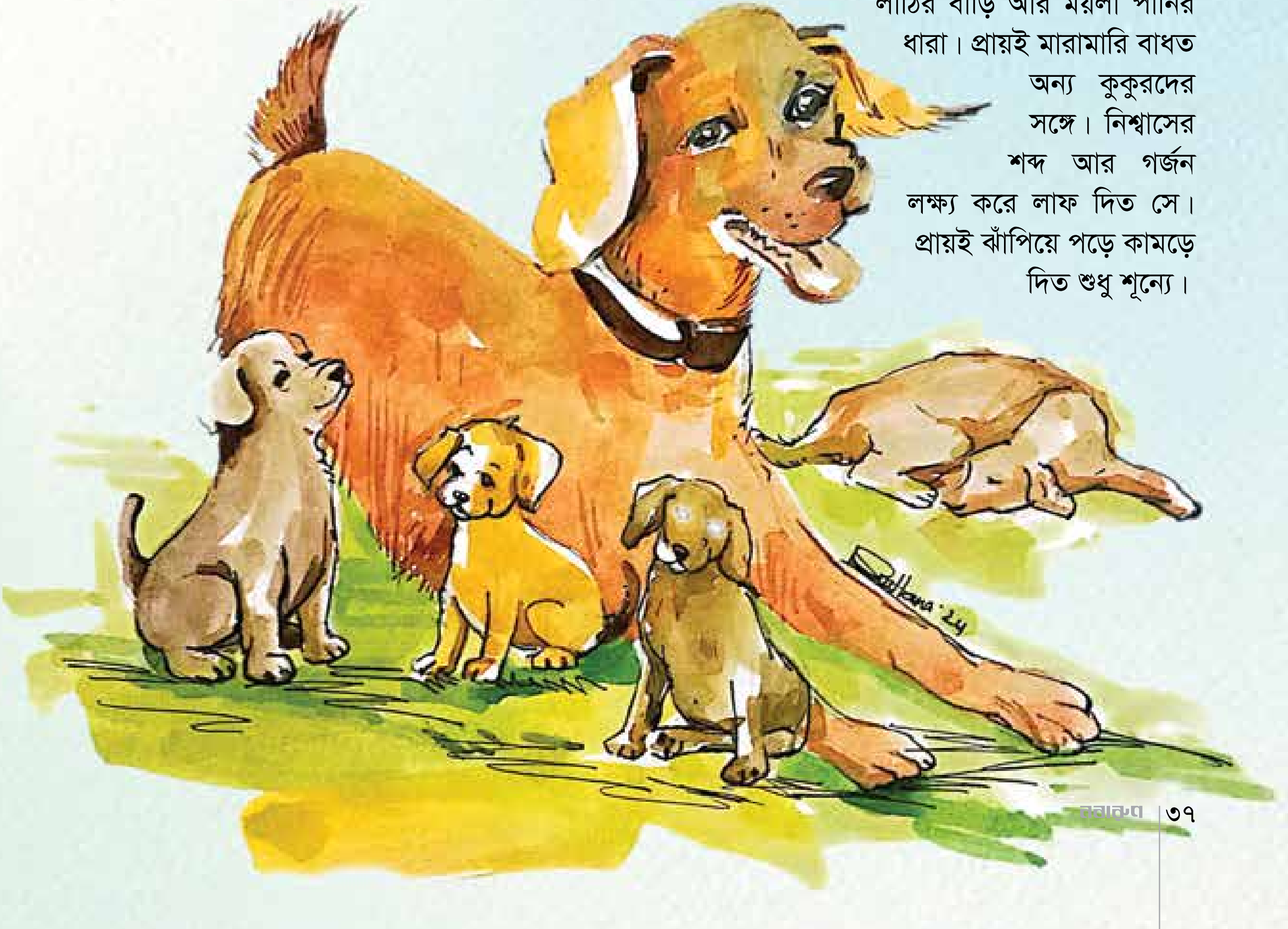

তার কোনো নাম ছিল না। নাম সে পেয়েছিল কীভাবে, সে এক গল্প। সেই গল্প জানব বলেই কি আমি এসেছিলাম এই শহরে? শহরটা ছোট্ট। এক পাশে বয়ে চলেছে রত্নাবলী নদী। তাতে সারাদিন নৌকা চলে। আমি তো প্রথম এসে শুধু এই নদীটা দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই সত্তর সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এসেছিলাম। পাকিস্তানে সেই প্রথম নির্বাচন হলো। বিপুল ভোটে জনগণের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সবার মতো আমিও ভাবছিলাম, এইবার বাঙালিরা একটু শান্তি পাবে। কলেজের বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছি। কেবল বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে নতুন জায়গায় এসে একটু একটু মন খারাপ ভাব হয়। তখন সেটা পুষিয়ে দিচ্ছিল নদীটা আর আমাদের টুকুন সোনা। টুকুন হচ্ছে কলেজের প্রিন্সিপাল হাবিব শেখের ছোট্ট ছেলে। টুকুনদের দোতলা বাড়িটার একতলার একটি ঘরে থাকি। ঠিক উলটো দিকে বাঁশ গাছের ছায়ায় ঘেরা বেশ বড়ো একটি উঠান। এখানেই হামাগুড়ি দেয় টুকুন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ফোকলা মুখে হেসে দেয়। বড়োদের দেখাদেখি দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। পড়ে যাবে ভাবলেই ধরে বসে বড়োদের কাউকে।

এক দুপুরে টুকুনের কাণ্ড দেখে অবাক আমরা। টলোমলো পায়ে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ধরে বসেছে যাকে তাকে আমরা এর আগে কেউ দেখিনি। এক নোংরা অসুস্থ কুকুর। টুকুনের মা ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। দৌড়ে গেলেন। বকছেন আলির মা'কে। টুকুনকে দেখে রাখার দায়িত্ব তার। আলীর মা দূরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে, ক্যামুন দুরন্ত পোলা! আমি আমার তিন কুড়ি জেবনে এমুন দেহি নাই। বাব্বারে বাব্বা!

টুকুনের মা কাছে গিয়ে এক টানে টুকুনকে কোলে তুলে নিতে চান। পারেন না। ছেলেটা শক্ত হাতে কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করলেন টুকুনের মা। এদিকে বাড়িতে আমি ছাড়া কেউ নেই। ছুটে গেলাম। আমাকে দেখে চিৎকার অনুরোধে পরিণত হলো। ভাই দেখেন তো ছেলে কী করছে! এই কুকুরটা ওকে যদি খেয়ে ফেলে! ভাই ওকে বাঁচান! আমার টুকুনকে বাঁচান!

দেখলাম, নিতান্ত অসুস্থ একটা কুকুর। বয়স খুব একটা বেশি না। লড়াইয়ের চিহ্ন সারা গায়ে। রক্ত লেগে আছে। নখ আর দাঁতের দাগ দেখছি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে আর মৃদু গরগর করছে। ওদিকে টুকুন হাসছে ফোকলা মুখের সোনা ছড়ানো হাসি। কুকুরটার চোখের ছাই রঙের পর্দাটা চোখে পড়ল। অন্ধ বলেই হয়ত ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথবা হয়ত বুঝতে পারছে, এক ক্ষুদ্র মানব শিশু ওকে ধরে দাঁড়িয়েছে। একটু নড়লেই শিশুটি পড়ে যাবে, ব্যথা পাবে। ও মনে হয় কখনো কোনো মানুষের উপকার করার সুযোগ পায়নি। এই প্রথম পেয়ে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়েও দায়িত্বশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। আমি টুকুনকে মায়ের কোলে দিয়ে ওকে নিয়ে পড়লাম। সারা দুপুর ডেটল দিয়ে ক্ষতগুলো ধুয়ে দিলাম। চুপচাপ ব্যথা সহ্য করেছিল ও। প্রায়ই কেঁপে উঠছিল ব্যথায়। মৃদুস্বরে কুঁইকুঁই করছিল। আহা বেচারা! একসময় ঘা সেরে গেলেও ওকে কিন্তু বাড়িছাড়া করা গেল না। টুকুনের মা অনেক চেষ্টা করেও পারলেন না। শেষমেষ আমাদের সাহায্য চাইলেন। আমরা মানে আমি আর টুকুনের বাবা হাবিব ভাই। কিন্তু ওসবে তখন আমাদের একটুও মন নেই। খবরের কাগজ পড়ি। রেডিও শুনি। দু'জনে মিলে বলাবলি করি, কী হচ্ছে দেশে! নির্বাচনে জয় লাভ করার পরও বাঙালির জয় কেড়ে নিতে চাইছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপের নামে সময় নষ্ট করছে। এতে তাল দিচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের এক নেতা। নাম জুলফিকার আলী ভুট্টো। দারুণ বদমাইশি করছে! খুব রাগ হয় আমার। আমাদের। দেশের প্রেসিডেন্ট দেশের মানুষের সাথে বেইমানি করছে! এর ফল ভালো হবে না। এমনই মনে হতো আমাদের।

বঙ্গবন্ধু কী ভাবছিলেন? তিনি ভাষণ দেবেন মার্চ মাসের ৭ তারিখে। কী বলবেন তিনি? তুমুল আলোচনা চলছে শহরের আনাচে-কানাচে। টুকুনের জ্বর ছিল। খুব ইচ্ছে থাকলেও হাবিব ভাই ঢাকায় যেতে পারলেন না। টুকুন হচ্ছে বাড়ির আনন্দ। ওর সামান্য কিছু হলেই হই হই রব উঠে যায় চারদিকে। আর টুকুন কী করে সারাক্ষণ? ভোলার পেছনে হামাগুড়ি দেয়। অন্ধ কুকুরটার নাম আমি ভোলাই রেখেছি। ওর চোখের

আলো দিতে ভুলে গিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা। আমি এর দায়ভার বেচারার ঘাড়েই চাপালাম। কলেজের অনেক ছাত্র ঢাকা যাচ্ছে। ওদের সাথে চলে এলাম আমিও। যদিও মনের অর্ধেকটা ফেলে এসেছি টুকুনের কাছে। আমি ওদের কেউ নই। কিন্তু কী মায়া যে লাগে ফোকলা মুখের সোনাটার জন্য! বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কথা আর কী বলব! সারা শরীরের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছিল! ভাষণ শুনতে আসা জনস্রোতের মতোই। যতদিন বেঁচে থাকব সেই গৌরবময় স্মৃতি আমার মনের মধ্যে একদম গাথা হয়ে থাকবে। ভুলব না।

কোনোদিন ভুলব না। আমি ফিরে এসে হাবিব ভাইকে খবর দিলাম। বিশাল এক খবর। ডাক এসেছে। মুক্তির ডাক। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' খেলা ফাইনাল হাবিব ভাই! আর বসে থাকা যাবে না। আমরা প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। এবার মরণ কামড় যদি দেয় ওই পশ্চিমারা, তবে আমরাও লড়ব। বীর বাঙালির হাতে কেমন জোর দেখিয়ে দেবো। ফরহাদ নামের এক চমৎকার হাসিখুশি ছাত্র পেয়েছিলাম কলেজে। শুধু অট্টহাসি দেয়। হাসি থামলে বলে, স্যার! রুটির জোর বেশি না ভাতের জোর বেশি এবার দেখা যাবে।

লড়াই হবে। মনে মনে সবাই বুঝতে পারছিলাম এটা। ওদিকে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সাথে নরম সুরে আলাপ চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবি এ কী রকম রঙ্গ! গোড়া কেটে আগায় পানি দেওয়ার মতলব নয় তো? হাবিব ভাই মুখ শুকনো করে বলেন, কী যে হবে! এই করে করে মার্চ মাসের শেষ এসে গেল। সারা শহর চুপ হয়ে গেছে। যদিও দেখে মনে হয় সবকিছু ঠিক আছে।

সেই ছোট্ট শহর, রত্নাবলী নদী, টুকুন সোনা, পায়ের কাছে ঘুরঘুর করা ভোলাটা। মাঝে মাঝে রাত্তিরে করুণ সুরে ডেকে ওঠে ভোলা। মানুষগুলো

ফিসফিস করে কথা বলে। হাসে না। দ্রুত হেঁটে বাড়ি চলে যায়। দেখা হলে মাথা নাড়ায় আর বলে, নতুন কিছু শুনলেন ভাইজান? শোনেন নাই ওরা নাকি মাটি রাখবে, মানুষ রাখবে না। বাঙালি রাখবে না। এ কেমন কথা ভাইজান?

বলেন!

বললেই হলো! বাঙালির দেশে বাঙালি থাকবে না? ওদের কথামতো হবে নাকি সব? হাবিব ভাই রেগে ওঠেন। ২৭ তারিখের দিকে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসতে থাকে মানুষের মিছিল। তাদের মুখে শুনলাম ওদিকে কী সর্বনাশ ঘটে গেছে! ঢাকা আমার প্রিয় শহর। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়টা কাটিয়েছি ওখানে। আমার মা ঢাকায়। খালার বাসায় রেখে এসেছিলাম। নতুন চাকরি একটু গুছিয়ে তবে মাকে নিয়ে আসব ভেবেছিলাম। ৭ই মার্চের ভাষণ শুনতে গিয়ে ঢাকায় গেলাম। তখন মা'কে বারবার বলেছি আমার সাথে আসতে। খালু থাকেন কানাডায়। বাড়িতে খালা ছোটো দুটো ছেলে নিয়ে একা। তাই মা এলেন না। দুশ্চিন্তায় পাগলের মতো হয়ে গেলাম। মা ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই!

হাবিব ভাইয়ের ছোটো ভাই তার তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে এসেছেন। তাদের কাছে খুঁটিনাটি শুনি আর রাগ হয় খুব। ঢাকা এখন মৃত শহর। মানুষের লাশের গন্ধে নাকি বাতাস ভারী হয়ে থাকে সারাক্ষণ। সহ্য করতে পারি না। ভীষণ কষ্ট হয় আমার। কিন্তু এই শহরটাতেও যে শয়তানের কালো থাবা এমনভাবে এসে পড়বে তা আমরা একটুও টের পাইনি। ঢাকা থেকে খুব একটা দূরে নয় রত্নাবলী নামের নদীর পাশের শহরটি। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের কথা। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় যমদূতের মতো গাদাখানেক পাকিস্তানি আর্মির ট্যাংক চলে এল রাস্তায়। পালাতে হবে এক্ষুণি!

আমার কলেজের ছাত্ররা এসে খুব দ্রুত সরে পড়তে বলল আমাদের। আপাতত পালাতে হবে। নইলে প্রতিরোধ গড়ার সুযোগটাও পাবো না। কিন্তু শহরের সব লোক কী পালাতে পারবে? দূর থেকে ভেসে আসছে চিৎকার। সন্ধ্যার আকাশে কী তীব্র আলোর ঝলকানি! মানুষের ঘর পুড়ছে। মানুষ মরছে। হাবিব ভাই ঘৃণায় কুঁকড়ে উঠে বললেন, যাব না। আমার মানুষেরা মরছে। আর আমি পালিয়ে যাব কাপুরুষের মতোন? অসম্ভব! বোঝাই হাবিব ভাইকে। আপনাকে যেতেই হবে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে লড়তে ফিরে আসব।

রত্নাবলী নদীর বুকে নৌকায় আমরা মোট ১১জন মানুষ। শুনতে পাচ্ছি ভেসে আসা দানবের কুৎসিত অট্টহাসি। গাদ্দার বাঙালি কো খতম কার দো! চোখে ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছি ফেলে আসা শহরটার দিকে। টুকুন ঘুমাচ্ছে মায়ের বুকে। ভোলাকে ভুলেই গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু নৌকা ছাড়ার একটু পরে পানিতে ঝপাৎ শব্দ হতেই চমকে উঠি। তাকিয়ে দেখি অন্ধ ভোলা সাঁতার শুরু করেছে। আমি ফিসফিস করে ওকে বলি, হেই! হেই ভোলা! এদিকে এদিকে!

ও তো শব্দ বুঝে পথ খুঁজে নেয়। এভাবেই নৌকায় উঠে এক কোনায় বসে থাকে। ছানিপড়া চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল শহরটার দিকে। কী ভাবছে ও, কে জানে! হয়ত মানুষের পাশবিকতা দেখে মনে মনে স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। ভাগ্যিস ও মানুষ হয়ে জন্মায়নি। আমরা কিন্তু সে রাতে পালাতে পারিনি। হঠাৎ টর্চের আলোয় সব ফর্সা হয়ে গেল। আমাদের নৌকা তখন তীর থেকে সামান্য দূরে আসতে পেরেছে। ওইখানেই থেমে গেল সেটা অনন্তকালের জন্য। আমার চারপাশে মৃত্যুযন্ত্রণা মেশা আর্তচিৎকার। পাথর হয়ে গেলাম নাকি মরে গেলাম, দুই সেকেন্ডের জন্য বলতে পারব না। না, আমি মরিনি। আমিই কেবল বেঁচে রইলাম, আর কেউ না। মায়ের বুকে ঘুমাচ্ছিল টুকুন, আমার ফোকলা মুখের সোনাটা। ওর মুখটা রক্তে লাল হয়ে আছে।

হাবিব ভাই খোলা চোখে চুপচাপ তাকিয়ে আছেন তারা ভরা আকাশের দিকে। এরপর আর কিছু জানি না আমি। কোন শক্তিতে নিঃশব্দে পানির তলে ডুব দিয়েছিলাম জানি না। তীর থেকে ভেসে আসছে কুৎসিত আনন্দধ্বনি আর হই-হুল্লোড়মাখা কথাবার্তা। চিনলাম কণ্ঠ একজনের। আমাদের কলেজের পিওন শওকত! তার সাথে আর সব অচেনা উর্দুভাষী পাকিস্তানি সৈন্যরা।

ওরা ভেবেছিল সবাই মরে গেছে। তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি ভাসতে ভাসতে...। থাক সে কথা। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিলাম। যুদ্ধে গেলাম। দু'চোখে শুধু টুকুন সোনার ফোকলা মুখের ছবি ভাসে। কাঁদিনি আমি। কখনো কাঁদিনি। কান্নার সময় পেলাম কোথ য়ায়? যুদ্ধ করছি না! যুদ্ধ করছিলাম। রত্নাবলী নদীর বুকের উপর দু'-দু'টো অপারেশন করলাম। তখন শুধু বিড়বিড় করে বলেছি, টুকুন সোনা! সোনা টুকুন...।

সেপ্টেম্বরে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত দেখেছি। ওকে স্বপ্নে দেখেছি। ভোলাকে ও কীভাবে জড়িয়ে ধরেছিল সেটা খুব মনে পড়ত। আলীর মা বিড়বিড় করে বকছিল। এমন দুরন্ত ছেলে তিন কুড়ি জীবনে দেখেননি আলীর মা! ধরা পড়ার পর আমাকে দেখে শওকতটা খুব হাসছিল। আমার রক্তাক্ত শরীর দেখে হাসি আর থামে না। আমিও হাসলাম। গলায় সবটুকু জোর এনে বললাম, জয় বাংলা।

দপ করে যেন নিভে গেল বদমাইশটার সব আলো। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করব। কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। পাকিস্তানকে ভাঙতে চাস? এত বড়ো সাহস তোর!

আমি জবাবে ওর মুখে থু থু ছিটালাম। তারপর হাসতে শুরু করলাম। যেন খুব মজা পেয়েছি। ঢ্যাঙা মতো এক লোক, মেজর রফিক নাকি নাম, শওকতের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, দিস ম্যান ইজ মুক্তি? বাট.... লুক হি ইজ বেটার দেন ইউ। ইয়েলোগ বাঙালি হোয়া তো কেয়া হুয়া। বহুত হিম্মতওয়ালা আদমি। লেকিন তোমহারা মানিন্দ (মতো) গাদ্দার নেহি।

শওকত আরক্ত মুখে নিজের নোংরা পায়ের দিকে তাকিয়েছিল। কী যেন বলছে বিড়বিড় করে।

মেজর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ইয়ে গাদ্দার মুক্তি! তোম বোল কেয়া পানিশমেন্ট তোম লে গা?

জবাবে আমি মেজরের ঠিক চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললাম, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। কোথায় দাঁড়িয়ে আছ টের পাচ্ছ না? এ তো আমার দেশের মাটি। বাংলাদেশের মাটি। নিজের জন্য পানিশমেন্ট ঠিক করোগে যাও। এই বেইমানকেও সাথে নিও চিন্তা করার সময়। হা হা হা!

শওকত তোতলাচ্ছে। নালিশের স্বরে বলল, স্যা... স্যা...স্যার। ইয়ে মুক্তিকো...

মেজর আমার দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে যায়। বলল, হ্যাঁ। ইয়ে তোমহারা দেশ হ্যায়।

অফকোর্স ইটস ইউর মাদারল্যান্ড।

খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে মনে হয় মেজরটা। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। চুপ হয়ে কী যেন ভাবছে। অন্ধকার নামছে শহরে। দূর থেকে ভেসে আসছে রত্নাবলীর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ঘরে ফেরা পাখিদের ডাক। ওরা কি টের পাচ্ছে না আমি একটু পরেই ওদের ছেড়ে চলে যাব? টের পাচ্ছে না? আশ্চর্য!

মেজর হুকুম দিল, উসকো নিকালো ইহাসে!

এখান থেকে নিয়ে কী করবে আমাকে? কোথায় নেবে? ওরা আমার দু'হাত পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বেঁধেছে। রত্নাবলীর পাড়ে টেনে নিচ্ছে আমাকে। বুঝলাম, রত্নাবলীর পাড়ে মারা হবে আমাকে। ভালো ভালো! টুকুন সোনাতো নদীটার বুকেই হারিয়ে গেছে। আমি এর চেয়ে ভালো মৃত্যুর উপায় আর খুঁজে পেতাম না।

কী ভালো হলো!

একজন রক্তাক্ত মুক্তিকে মারতে কত সৈন্য এসেছে! রাজাকারও কম নেই। সবার সামনে শওকত। খুব খুশি সে। নিজেকে বেশ ভিআইপি বলে মনে হচ্ছে। মনে মনে নামতা পড়ছি। দুইয়ের ঘরের নামতা। হঠাৎ সব থেমে গেল দুই সেকেন্ডের জন্য। ভেসে এল মেজরের মরণ চিৎকার। এক সৈন্য গলা ফাটিয়ে বলল, মুক্তি মুক্তি!

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি আমিও। কীসের গর্জন শুনছি? বীর মুক্তিযোদ্ধারা কি নেকড়ের মতো গর্জন করে আক্রমণ করতে শিখে গেছেন? নাকি সত্যিই নেকড়ে এসেছে? কোথায় নেকড়ে?

মাত্র ২-৩ মিনিটের ঘটনা, অথচ মনে হলো তিন ঘণ্টা ধরে ঘটল। মেজরের চিৎকার বদলে গেল মৃত্যুযন্ত্রণার গোঙানিতে। এরপর অন্ধকারের বুক থেকে ছুটে এল কিছু একটা। যেন শুন্যে লাফ দিতেই সন্ধ্যার ছাই রং আকাশে ফুটে উঠল ওটার অবয়ব।

আমি তো ভয়ে কাঁপছি। নদীর পানিতে অর্ধেক শরীর ডোবানো। ওরা তো আমাকে মাটিতে ফেলে রেখেছিল। সেভাবেই পড়ে আছি। মানুষের আর্তচিৎকার, রাইফেলের গুলির শব্দ আর কুকুরের গলার গরগর শব্দ– সব মিলিয়ে আমার মাথা খারাপ করে ফেলল। কখন থামবে এই যন্ত্রণা?

থেমে গেল সব এক সময়। শওকত কেন, একটা সৈন্যও পালাতে পারেনি ওটার হাত থেকে। প্রত্যেকের কণ্ঠনালী টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে নির্ভুলভাবে। এরপর টলতে টলতে ওটা এগিয়ে এল আমার দিকে। ভয়ে কাঁদছি আমি। এবার কি আমার পালা?

কী আশ্চর্য! ওটা আমার কাছে এসে ঠিক আমার পাশে শুয়ে পাগলের মতো আমার শরীরে ওর মাথা ঘষতে লাগল। একদম যেন আমাদের ভোলার মতো ভাবসাব। হ্যাঁ, ওর আচরণ আমাকে ভোলার কথা মনে করিয়ে দিল। হঠাৎ এও মনে হলো, ও আমাদের ভোলা নয়তো?

সে রাতে ভোলাকে আমি কীভাবে দেখেছিলাম? শেষ পর্যন্ত ভোলাকে নৌকায় দেখেছিলাম কী? গুলির ঝাঁক এড়িয়ে ও কি পালাতে পেরেছিল? হয়ত পেরেছিল।

কুকুরের স্বভাবমতো ও আমার শরীরের গন্ধ মনে রেখেছিল। সেই গন্ধ পেয়েই ও আমার বিপদের সময় ছুটে এসেছে।

কিন্তু, ও এতটা হিংস্র কীভাবে হলো? কুকুররা যে মানুষের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত শক্তির তরঙ্গ যাচাই করে বোঝে কে ভালো মানুষ আর কে খারাপ। কুকুররা এভাবেই খারাপ মানুষ চিনে তেড়ে আসে। আর ভালো মানুষের কাছে যায় বন্ধু হতে।

মৃদুস্বরে ডাকলাম, ভোলা!

জবাবে ও আরো সরে এল আমার কাছে। তাহলে কি সত্যিই আমাদের ভোলা?

আমি তো উপুড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছি। ওকে যে একটু আদর করব তার উপায় নেই। তাই মুখেই বলে চলেছি, ভোলা! ওরে ভোলা! তুই কি সত্যিই ভোলা?

তুই কোত্থেকে এলি বেটা? তুই যে আমাকে বাঁচালি! ওরে ভোলা, বল, তুই কী চাস আমার কাছে? বল,

আমি তোকে সব দেবো... সব। এই দেশটাই দিয়ে দেবো তোকে। যা দিয়ে দিলাম। আমার দেশটা এখন তোরও। বল, ভোলা, বল জয় বাংলা। বল আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

নদীর পাড়ের ভেজা মাটিতে গাল লাগিয়ে আমি গাইছি আর ওটা মৃদু কুঁই কুঁই করছে। আসলে ওর গায়ে গুলি লেগেছিল। একটা না অসংখ্য গুলি। আস্তে আস্তে ও

নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছে, টের পাচ্ছি। আমি ওকে কথা দিয়ে আদর করতে থাকি। অনেক অনেক আদর। এক সময় টের পাই, রত্নাবলীর বাতাসে ভর দিয়ে ওর আত্মাটা উড়ে গেল।

পরদিন সকালে এক মাঝি আমাকে দেখতে পেয়ে হাতের বাঁধন খুলে ঠিকমতো বসিয়ে দিল। তখন দেখলাম, ঠিক ভোলার মতো দেখতে এক কুকুর মরে পড়ে আছে।

দু'চোখ স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে খোলা আকাশের দিকে। ছাইরঙা পর্দায় ঢেকে আছে চোখের মনি। মাঝিটাকে বললাম, ও তো ভোলা! আমাদের ভোলা!

আস্তে আস্তে শহরের মানুষরা এসে ভিড় করল নদীর পাড়ে। একগাদা পাকিস্তানি সৈন্য আর চারজন রাজাকার মরে পড়ে আছে। আমি ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে আছি ভোলার স্থির শরীরটার দিকে। কানে এল কে যেন আমাকে দেখিয়ে বলছে, মুক্তিবাহিনীর লোক! মুক্তিযোদ্ধা! মুক্তি আমার দু'চোখ ভিজে গেল। আমি তো মুক্তি। আর ভোলা যে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মরে গেল! অন্ধ কুকুরটা একটা শত্রুকেও বাঁচতে দেয়নি। প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধটা জিতে নিয়েছে একা একাই।

আমার মনের ভেতরে থাকা মন কেঁদে উঠল। টুকুন সোনাকে বলল, ও আমাদের ভোলা! ও টুকুন সোনা, ও আমাদের ভোলা! দেখেছ তুমি?

রত্নাবলীর বুক থেকে উঠে আসছে সূর্যটা। স্পষ্ট দেখলাম ওটা আসলে টুকুন সোনার মুখ। টুকুন সোনা ফোকলা মুখে হাসছে। খালি হাসছে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

স্বাধীনতা

তানিয়া তানি

২৫শে মার্চ কালরাত
ঘটনাটি ঘটেছিল হঠাৎ
হানাদার বাহিনী দিয়েছিল হানা
মানুষের মনে তা ছিল না জানা!

বাড়ি ফিরে লোকজন সারাদিন কাজ শেষে
নিশ্চিন্তে ঘুমায় তারা খুব অনায়াসে
শুরু হয় আক্রমণ, যুদ্ধের প্রথম ধারা
কত প্রাণ চলে গেল অপরাধ ছাড়া।

২৬শে মার্চ প্রথম প্রহর; ঘোষিত হলো স্বাধীনতা
বঙ্গবন্ধুর মুখে রচিত ওটাই ছিল যুদ্ধের বারতা,
শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ, চলল নয় মাস
এই সময়ে কত মানুষের হলো সর্বনাশ।

সম্ভ্রম হারিয়েছে দুই লাখ মা-বোন, ঝরিয়েছে অশ্রুধারা
শহিদ হয়েছে ত্রিশ লক্ষ ভাই, বহিয়ে রক্তের ফোয়ারা!
হারিয়েছি কত বুদ্ধিজীবী, হারিয়েছি দেশের মাথা;
এত কিছুর বিনিময়ে আজ পেয়েছি স্বাধীনতা!

গল্প

মুক্তিযোদ্ধা গাছভাই

আশিক মুস্তাফা

দিনের আলো নিভতেই অরণ্যদের বাড়িতে হইচই! দিদিভাই বুক চাপড়ে বলেন, এখন কী হবে গো?

পাশের ঘরের মিনু কাকি তো বিলাপই শুরু করে দিলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তিপি। অরণ্যের ছোটোবোন তিপিয়া। তাকে আদর করে অরণ্য ডাকে তিপি। সে কেবল অজুহাত খোঁজে কাল্পনিক। পান থেকে চুন খসতেই-ভ্যাঁ! অরণ্য তো মাঝে মধ্যে তাকে ডাকে ছিঁচ-কাঁদুনে তিপি। সেই তিপির সামনে এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল ভাইয়ের; সে কল্পনা করবে না?

অরণ্যের মা মোবাইলের ডাটা অন করে ভিডিও কল দিলেন। অরণ্যের বাবা কল রিসিভ করেই শোনেন শোরগোল। বাবা হ্যালো বলতেই অরণ্য দৌড়ে এসে বলে, বাবা, জানো আমি একটা বরই বিচি গিলে ফেলেছি!

বাবা মুচকি একটা হাসি দিয়ে বললেন, তাতে কি হয়েছে বাবা; বরই বিচি আমিও কত গিলেছি ছোটোবেলায়। তাই বলে এমন কান্নাকাটি করতে হয়?

অরণ্য বলে, দিদিভাই বললেন, এখন নাকি আমার

পেটে বরই গাছ জন্মাবে। সেই গাছ বড়ো হলে আমি পুরোপুরি গাছ হয়ে যাব। আমি আর মানুষ থাকব না বাবা; তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারব না বাবা?

এই বলে সেও ভ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্না জুড়ে দেয়।

বাবা এবার অট্টহাসিতে হেলে পড়েন। অরণ্য অবাক হয়, ছেলে গাছ হয়ে যাবে আর বাবা তা শুনে হাসছেন; এ কেমন বাবারে এটা?

এদিকে এ খবর রটে গেল পাড়ায়। বউ-ঝিদের ফিসফাস! অরণ্যের ভয়, স্কুলের বন্ধুরা যদি জেনে যায় তবে তো কেউই তাকে আর খেলায় নেবে না। তার সঙ্গে স্কুলে যাবে না, ফেরার পথেও একসঙ্গে আসবে না। সে আরও ভাবে, আচ্ছা, গাছটা জন্মাতে কত দিন সময় লাগবে? পাতাগুলো কি মাথার উপর দিয়ে গজাবে; নাকি পেটেই থাকবে আপাতত? আর বরই গাছে তো কাঁটা থাকে সেই কাঁটার গুঁতো খেয়ে তো তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এখন সে কী করবে?- এসব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা গড়াতেই ঘুমের দেশে তলিয়ে গেল। রাতের খাবারটাও খাওয়া হয়নি।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে জেগে কয়েকবার পেটে হাত বুলিয়ে দেখল। কই, তেমন কিছু বুঝা যাচ্ছে না। চুপি চুপি দরজা খুলে মায়ের চোখ এড়িয়ে চলে গেল মুক্তিযোদ্ধা দাদাভাইয়ের কাছে। ১৯৭১ সালে যাঁর সাহসিকতায় অরণ্যদের এখলাছপুর গ্রাম রক্ষা পেয়েছিল পাক সেনাদের হাত থেকে। কেবল এখলাছপুরই না; দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক পড়ত দাদাভাইয়ের। তিনি একাত্তর সালে রাইফেল কাঁধে যুদ্ধ করতেন না। কেবল ব্রিজ গুড়িয়ে দিতেন দক্ষ হাতে। যেই গ্রাম বা শহরে পাকিস্তানিরা আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করত সেই এলাকায় ডাক পড়ত দাদাভাইয়ের। এক ভোরের কথা- চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। দাদাভাইকে তাঁর কমান্ডার কাছে ডেকে বললেন, ‘শোনো, আশপাশে তাকাবে না। তবে কান খাড়া রাখবে খরগোশের মতো, যাতে শত্রুর আনাগোনা টের পাও। খুব সাবধানে গিয়ে বারুদের তারে আগুন ধরিয়ে দিয়েই চলে আসবে; সাবধানে কিন্তু!’

কমান্ডারের কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে কাজটা ভয়ংকর। তবু একটুও ভয় পায় না মুক্তিযোদ্ধা দাদাভাই। তাঁর কেবল বুকে নয়; শরীরজুড়েই সাহস! কোমরটা গামছা দিয়ে একটু শক্ত করে বেঁধে তারপর ড্যামকেয়ার ভাব নিয়ে বারুদের তারে আগুন ধরাতে পথে নামেন। নিঃশব্দে এগিয়ে যান। জায়গামতো পৌঁছে আস্তে আস্তে কোমরের গামছায় লুকিয়ে রাখা ম্যাচ বের করেন। কিন্তু না; আগুন ধরছে না। পানি পাড়ি দিয়ে আসার সময় বারুদ ও ম্যাচের কাঠি ভিজে জবুথবু হয়ে গেছে। ভড়কে যান দাদাভাই। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে যেন। তবু চেষ্টা করেন। না, সেফটি ফিউজ ও বারুদের তারে কোনোভাবেই আগুন ধরানো যাচ্ছে না। চেষ্টা চালিয়ে যান তিনি। একই সঙ্গে বুদ্ধিও। মাথা খাটিয়ে তিনি জামার শুকনো অংশের সঙ্গে বারুদ ঘষতে থাকেন। একসময় গরম হয়ে উঠে বারুদ। আর অমনি কাঠি মেরে আগুন ধরিয়ে বারুদের তারে আগুন লাগিয়ে পলটি খেয়ে পড়ে দ্রুত পেছনে চলে আসেন। দুই মিনিটের মাথায় কানে আসে বিকট ও ভয়ংকর শব্দ। জ্বলে উঠে আগুনের লেলিহান শিখা; ছড়িয়ে পড়ে রেলের স্লিপার, লোহার পাত, পাথরের গুঁড়িসহ রাজ্যের তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ভয়ে পাকিস্তানিরা আর অপারেশনের সাহস পায় না। লেজ গুটিয়ে পেছনে পালায়। সফল হয় অপারেশন এখলাছপুর ব্রিজ। নায়ক হয়ে উঠেন দাদাভাই। মাত্র সতেরো বছর বয়সি দাদাভাই অই অপারেশনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের আরো প্রিয় হয়ে উঠেন।

এই সাহসী দাদাভাই অরণ্যকে দেখে কাছে টেনে কুশল বিনিময়ের আগেই অরণ্য বলে, দাদাভাই, গাছ নিয়ে একটা গল্প বলো তো।

দাদাভাই কিছুটা অপ্রস্তুত। তবু অরণ্যকে পাশে বসিয়ে গল্প শুরু করলেন। বলেন, শোনো, একাত্তর সালের একদিনের কথা। তখন মধ্য দুপুর। খেতে বসেছে মুক্তিযোদ্ধারা। কমান্ডার আমাকে বললেন, ‘যাও তো বেনু মিয়া, বাইরে গিয়ে একটু দেখো তো পাকিস্তানি সেনাদের কেউ এদিকটায় আসছে কি না?’

আমি হুড়মুড়িয়ে বাইরে বের হই। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখতে থাকি। কাউকে দেখতে না পেলেও মনে কেন যেন একটা সন্দেহ ঢুকে। ফের ক্যাম্পে গিয়ে দুরবিন হাতে বের হই। তারপর ক্যাম্পের পাশের

একটা সুপারি গাছে উঠি তরতর করে। দুরবিনে চোখ লাগিয়ে চারদিক দেখতে থাকি। হঠাৎ আমার সন্দেহটা বাস্তবে রূপ নেয়। দেখি, পাকিস্তানিদের একটি গানবোট আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দ্রুত ক্যাম্পে খবরটা দিয়ে দিই আমি। খাবার ফেলে মুক্তিযোদ্ধারা তৈরি হয়ে যায়। খুব দ্রুত তারা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। বাইরে এসে পজিশন নিয়ে আক্রমণের অপেক্ষায় মুক্তিযোদ্ধারা। সবার সঙ্গে আমিও। পাকিস্তানিরা এগিয়ে এলেই আক্রমণের মুখে পড়ে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে যুদ্ধ। একপর্যায়ে হাল ছেড়ে দেয় পাকিস্তানিরা। ভয়ে পালিয়ে যায় সবাই। তবে সেদিন যাওয়ার পথে আমাকে লক্ষ করে গানবোট থেকে গুলি ছোঁড়ে পাকিস্তানিরা। অল্পের জন্য গায়ে লাগেনি। আমি গাছের আড়াল হয়ে যাই। বুলেট গিয়ে বিঁধে সুপারি গাছে।

অরণ্য বলে, তবে তোমাকে বাঁচিয়েছিল গাছ?

দাদাভাই বলেন, ঠিক ধরেছো।

অরণ্যর এবার দাদাভাইকে বলে, জানো দাদাভাই, কাল সন্ধ্যায় একটা বরই বিচি খেয়ে ফেলেছি আমি। সবাই বলছে আমার পেটে নাকি গাছ উঠবে?

দাদাভাই অরণ্যকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, না-রে দাদাভাই, এমন হলে তো সব মানুষই গাছ হয়ে যেত। ছোটোবেলায় সবাই এমন বিভিন্ন ফলের বিচি খেয়ে ফেলে। বড়োবেলায়ও যে এমন ঘটে না তা-না! তবে জানো, গাছ হলে অনেক ভালোই হতো।

অরণ্য বলে, কেন?

দাদাভাই বলেন, গাছ হতে পারলে আমি গাছপালায় ঘেরা আর রোদ ঝলমলে নদী পাড়ের বনে থিতু হতাম। সেই সুপারি গাছটার পাশে। যেই গাছ নিজের ভেতর বুলেট নিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছিল একাত্তরে। আশপাশে থাকত আরো অসংখ্য গাছ। কাঠবাদাম গাছের লাল হয়ে যাওয়া বড়ো বড়ো পাতা দেখে একাত্তরের কথা ভাবতাম। ভাবতাম মুক্তিযোদ্ধাদের কথা।

অরণ্য বলে, আচ্ছা দাদাভাই, যুদ্ধ করে তোমরা মুক্তিযোদ্ধা হলে। সেই গাছটাও তো একাত্তরে যুদ্ধ করেছিল। তবে সে মুক্তিযোদ্ধা হলো না কেন?

দাদাভাই ভাবনায় পড়েন। ঠিকই তো যেই গাছ মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচিয়েছে সেই গাছওতো যোদ্ধা। এই গাছ যোদ্ধাদের কথা তো কেউ কখনো ভাবেনি!

অরণ্য বলে, চলো দাদাভাই, একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা গাছদের আমরা খুঁজে বের করি।

দাদাভাই বলেন, চলো। তবে তার আগে তুমি গাছ হয়ে নাও!

শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, দৈনিক সমকাল

বাবার যুদ্ধ

তৌহিদ-উল ইসলাম

আমাদের পেছনের গলিতে গতকাল একটা বাসায় লুট হয়েছে। সোনার অলঙ্কার, টেলিভিশন ও ফ্রিজসহ অনেক মূল্যবান সম্পদ নিয়ে গেছে। পরদিন একই সময়ে আর্মির মেজর মাইকে ঘোষণা দিচ্ছেন- আপনারা লুটপাট বন্ধ করেন, নতুবা কঠিন শাস্তি পেতে হবে আপনাদের। ঘোষণা শুনে মোবারক মুন্সি নিজের খ্যাতি বাড়াতে আর্মি ক্যাম্পে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তার বাড়ি লুট হবার বিষয়ে অভিযোগ করেন। তিনি আরো জানান যে, এ লুটপাট এলাকার যুবক ছেলেরা করেছে এবং তার জীবননাশেরও হুমকি দিচ্ছে। কারণ হিসেবে নালিশে উল্লেখ করেন, তিনি পাকিস্তানের সমর্থক এবং মুক্তিফৌজের আদর্শকে ঘৃণা করেন।

প্রকৃতপক্ষে মোবারক মুন্সির বাড়িটি লুট হয়নি। কিন্তু আর্মি তা বুঝবে কী করে। ফলে এ ঘটনা তদন্তের জন্য একজন নায়েক, এবং ছয়জন সৈনিক নিয়ে মুন্সির বাড়িতে যায়। ওরা এসে তার পুত্রবধূকে এবং তার পাশের বাড়ির ফয়েজ উদ্দিনের বিবাহিতা মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। পরের জুম্মার দিন সন্ধ্যায় মসজিদের উত্তরের একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে আর্মিরা কুদ্দুস মাওলানাকে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। কারণ হলো, তিনি দু-দিন আগে এক শহিদ মুক্তিযোদ্ধার জানাযা নামাজ পড়িয়েছেন।

ওদিকে মোবারক মুন্সি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বাড়ি লুটের বিষয়ে আমরা মন্টু ভাইয়ের কাছে রাতেই নিশ্চিত হয়েছি। লুটকারী যুবকদের মধ্যে তিনি একজন। লুটের মালামাল আর্মিদের গাড়িতে তোলার ফাঁকে তিনি পালিয়ে এসে আমাদের বাসায় ঢুকে পরেন। আর সে সময়ে বাবা ও আমি ঘরের মেঝেতে বসে একশ ও পাঁচশ টাকার নোট বাছাই করছিলাম। জয় বাংলা ও বাংলাদেশ লেখা টাকাগুলো খুঁজে খুঁজে আলাদা করছি। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী এ টাকাগুলো ব্যাংকে জমা নেবে না। তাই এ টাকাগুলো মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে ব্যয় করা হবে।

মন্টু ভাই আমার পূর্ব পরিচিত। একই স্কুলে আমার দুই ক্লাস উপরে পড়ত। এ বছর আইএ পরীক্ষা দেবার কথা। আর আমি মেট্রিক। লুটের বিষয়ে মন্টু ভাই জানালো, চৌদ্দজনের একটা বাঙালি দলকে লুটের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল আর্মি ক্যাম্পে। তারপর তাদেরকে মুক্তিফৌজ হিসেবে আর্মিরা লুটের কাজে ব্যবহার করছেন। আর লুটের মালামাল আর্মিরা ভাগাভাগি করে নিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে। বড়ো কর্তারাও পেয়ে যাচ্ছে লুটের একটা অংশ। অন্যদিকে সংবাদ পত্রগুলো জেনে যাচ্ছে মুক্তিফৌজদের লুটপাটের খবর। বিশেষ করে এসব খবর রেডিও পাকিস্তান খুব গর্বের সাথে প্রচার করছে।

মন্টু ভাইকে আমি অতি গোপনে আমার সব কথা জানালাম। বললাম, আমি মেট্রিক পরীক্ষা দেবার নাম করে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং করে এসেছি। দিন কয়েক হলো এসেছি বাড়িতে। কয়েক দিনের মধ্যে আমরা আবার ভারতের দিনহাটা যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে চলে যাবো যুদ্ধে।

আমার কথা শুনে লজ্জা পেলো মন্টু ভাই। বলল, এতদিন আমারও যাওয়া উচিত ছিল। মিছামিছি ওদের হাতে মরে আর লাভ কী! মরি তো যুদ্ধ করেই মরি!

মন্টু ভাই পরদিন ভোরবেলা চলে গেলেন আমাদের বাসা থেকে। যাবার পথে আমাকে চুপি চুপি বলে গেলেন, দ্রুত চলে যাবো ট্রেনিং নিতে।

দিন দশেক পরে আমরা যখন দিনহাটার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই তখন কালিগঞ্জের দক্ষিণের একটা গ্রাম থেকে ধোঁয়া উড়তে থাকে। সেই সাথে গোলাগুলির শব্দও শোনা যাচ্ছিল। সন্ধ্যায় আমরা দিনহাটা পৌঁছলাম অনেক কষ্টে। দিনহাটা পৌঁছার পর বাবা একটা জরুরি কাজে কয়েক দিনের জন্য কলকাতা চলে যান। আমি এই ফাঁকে মাকে ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধে চলে যাই। যুদ্ধে যাওয়া মানে প্রথমত আমাকে যেতে হলো প্রশিক্ষণ শিবিরে, যেখানে আমি প্রশিক্ষণ শেষ করেছি। প্রশিক্ষণ শিবিরে গিয়ে মন্টু ভাইয়ের সাথে দেখা। আজ তাঁর প্রশিক্ষণের নবম দিন। তার কাছে বাবার খবর পেলাম। বাবা নাকি বিভিন্ন যুব ও শরণার্থী শিবিরে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। গীতালদহ যুব শিবিরের পরিচালক চিত্তরঞ্জন দেবের সাথে বাবাকে বক্তৃতা করতে দেখেছেন। কলকাতা যাবার নাম করে বাবা এমন একটা কিছু করবেন, তা আমি বাবার হাবভাব দেখে পূর্বেই টের পেয়েছি। তাছাড়া আমার জানামতে কলকাতায় বাবার তেমন কোনো কাজ নেই। এটা মা আর আমাকে ফাঁকি দেবার কৌশল মাত্র।

একটি এসএলআর ইস্যু হলো আমার নামে। তারপর বিকেলে পনেরোজনের একটা দলের সাথে রওয়ানা হলাম বুড়িমারীর উদ্দেশ্যে। আপাতত ঠিকানা বুড়িমারী মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্প । তারপর সেখান থেকে যা হুকুম হয়।

কিন্তু হুকুমের জন্য অপেক্ষা করতে হলো না। বরং আমাদের পৌঁছার উপর নির্ভর করছে হুকুম পালন করা। কালই হাতিবান্ধা আক্রমণ করা হবে। রেকি করে

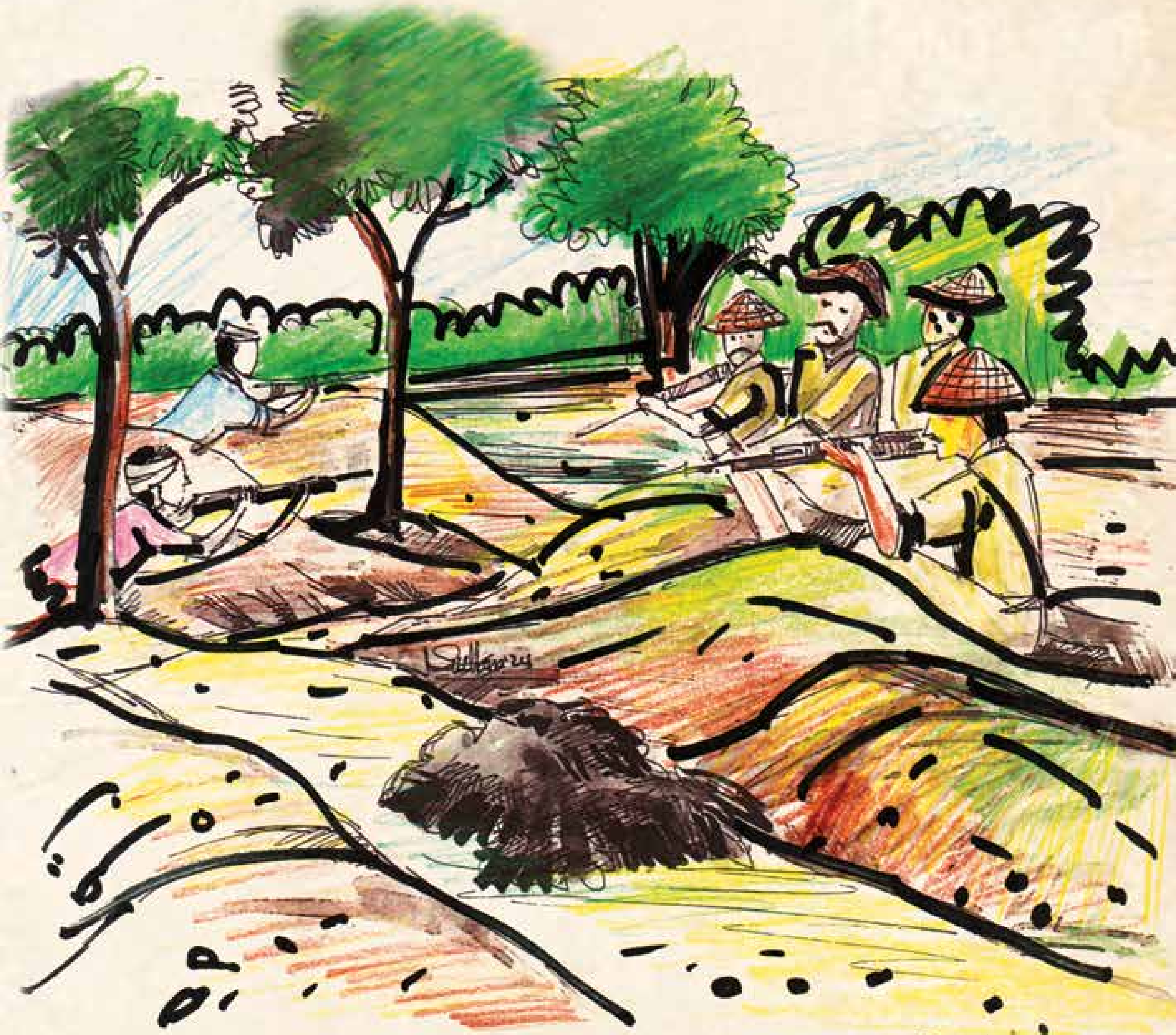

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুই দিক থেকে আক্রমণ করব। আমাদের সাথে এল খালেক নামের দশ কী এগারো বছরের একটি বালক। যদিও ট্রেনিং নিয়েছে, তথাপি বয়স বিবেচনায় ওকে কোনোদিন কোনো অপারেশনে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মূলত সে ক্যাম্পে ছোটোখাটো ধোয়া-মোছার কাজ করত। এই প্রথম অপারেশনে যাচ্ছে আমাদের সাথে। বলাবাহুল্য আমারও এটা প্রথম অপারেশন।

আমরা আক্রমণ চালাচ্ছি দু-দিক থেকে। শুরু হলো বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মিদের শক্তিশালী এইচএমজির কাছে আমরা টিকতে পাড়ছি না। ক্রমে আমরা পেছনে সরে আসছি। কিন্তু হঠাৎ দেখি খালেক পেছনে না ফিরে ক্রলিং করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে সে পৌঁছে যায় এইচএমজি পোস্টের সামনে। তারপর দুটো গ্রেনেড ছুড়ে মারে। থেমে গেল এইচএমজির আওয়াজ। এখানেই শেষ নয়। খালেক জানত তার ফিরে আসার পথ নেই। তাই সে এবার দ্রুত এসএলআর চালাতে লাগল। এভাবে খতম করল পাঁচজনকে। তারপর আহত অবস্থায় ধরা পরে গেল।

প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধ চালিয়ে আমরা যখন ধরলা নদীর দিকে নিরাপদ স্থানে ফিরছি ঠিক তখনই একটা বুলেট

এসে আমার ডান হাতের কনুইয়ের উপরে ফুটো করে চলে যায়। আমি লাফ দিয়ে মাটিতে পরে যাই। হ্যা, বুলেটই ছিল, তবে শত্রুপক্ষের নয়। আমাদের মুক্তিফৌজের একজনের বন্দুক থেকে হঠাৎ গুলি বেরিয়ে গেছে। আমাদের মুক্তিফৌজদের অনেকে ছিল অশিক্ষিত এবং অল্পদিনের ট্রেনিং-এ তারা তেমন দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে এ দুর্ঘটনা হলো। আমাকে নৌকায় করে পাঠানো হলো ফুলবাড়ীর নাওডাঙা হাইস্কুলের ফিল্ড হাসপাতালে। ওখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ইউনুছ আলী নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা আমাকে পাঠালেন কুচবিহার হাসপাতালে।

প্রথম দিনেই আমার অপারেশন করা হলো। তারপর থেকে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে আমার দিন কাটে। ডাক্তার বলেছে, হাড়ে ফুটো হয়েছে, সেরে উঠতে সময় লাগবে।

ভালো হয়ে কবে আবার যুদ্ধে যেতে পাড়ব-এ নিয়ে আমার মনটা বড়ো অস্থির। প্রায়ই খালেকের কথা মনে পড়ে। ওর বীরত্বের কাছে লজ্জিত হয়ে নিজের কষ্টের কথা ভুলে যাই। খালেকের বাড়ি ভুরুঙ্গামারীর বলদিয়ার বানুরকুঠি গ্রামে। পরে আমরা খবর পাই, খালেককে পাকিস্তানি আর্মিরা জিপের পেছনে বেঁধে রাস্তায় জিপ চালিয়ে মেরেছে।

হাসপাতালে এক মাস কেটে গেল। ইতোমধ্যে ভারতের উপর পাকিস্তানি আর্মির আক্রমণের ফলে ভারতবাহিনী যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে। আমার হাতেও শক্তি ফিরে আসছে। ডাক্তার বলল, আর সপ্তাখানিক পরে আমি ছাড়া পাচ্ছি। এ সাতদিন কাটল আমার সাত মাসের দূরত্বে। তারপর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যখনই রাস্তায় পা রাখলাম, সে মুহূর্তেই শুনতে পেলাম বিজয়ের স্লোগান। ঢাকায় পাকিস্তানি আর্মিরা আত্মসমর্পণ করেছে। আমি দিনহাটায় মায়ের কাছে ছুটে এলাম। বাবার জন্য দিনকয়েক অপেক্ষা করে মাকে নিয়ে ফিরে এলাম মাতৃভূমিতে।

বিজয়ের একমাস অতিক্রম হলো, বাবা ফিরল না। আমি দিনহাটায় চলে গেলাম আমাদের সেই আত্মীয়ের বাড়িতে। ওদের সহায়তায় খুঁজে বের করলাম গীতালদহ যুব শিবিরের চিত্তরঞ্জন দেবকে। তিনি জানান, শরিফুল্লাহ মাস্টার রৌমারি মুক্তাঞ্চলে চলে যান অক্টোবরের শেষের দিকে। রৌমারিতে মিলিটারি ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়েছিল। এ স্কুলে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি চলে গিয়েছিলেন।

আমি রৌমারি চলে যাই। রৌমারি সিজি হাই স্কুলের হেডমাস্টার আজিজুল হকের সাথে দেখা করি। তিনি জানান, শরিফুল্লাহ মাস্টারের এখানে আসার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসেননি। হয়ত পথে তিনি কোনো দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হতে পারেন।

তিনি আমাকে বসতে বলে অগ্রদূত পত্রিকার কপি আনতে গেলেন। তাঁর সম্পাদনায় রৌমারি মুক্তাঞ্চল থেকে হাতে লেখা সাপ্তাহিক অগ্রদূত পত্রিকা বের হতো। এ খবর আমি আগে থেকেই জানতাম। তিনি অগ্রদূতের অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বরের প্রথম সংখ্যাটি নিয়ে এসে শিরোনামগুলো পড়তে শুরু করেন। তারপর একটা খবর খুঁজে বের করে আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলেন, 'ব্রহ্মপুত্র নদীতে যাত্রী বোঝাই একটি নৌকায় পাকিস্তান আর্মির গোলাবর্ষণ। নৌকাটি চিলমারী থেকে পনেরোজন যুবকযাত্রী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং-এর জন্য ২৮শে অক্টোবর ভোরে রৌমারির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল'।

এই পর্যন্ত পড়ে তিনি কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, হতে পারে তোমার বাবা এ নৌকায় ছিল। আমি এ পথ দিয়েই তাঁকে আসতে বলেছিলাম।

দেশের জন্য, মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ করার কথা বাবা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছেন। সত্যিই তা গোপন থেকে গেল। একাত্তরের বিশাল ইতিহাসের পাতা থেকে, ত্রিশ লক্ষ প্রাণের মৃত্যুর মধ্য থেকে বাবাকে খুঁজতে আর সাহস পাইনি। ফিরে এসে মাকে বললাম, বাবা আমাদের কাছে যা গোপন করতে চেয়েছেন, তা গোপন থাকাই ভালো। ❑

শিক্ষক, শিশুসাহিত্যিক ও গীতিকার

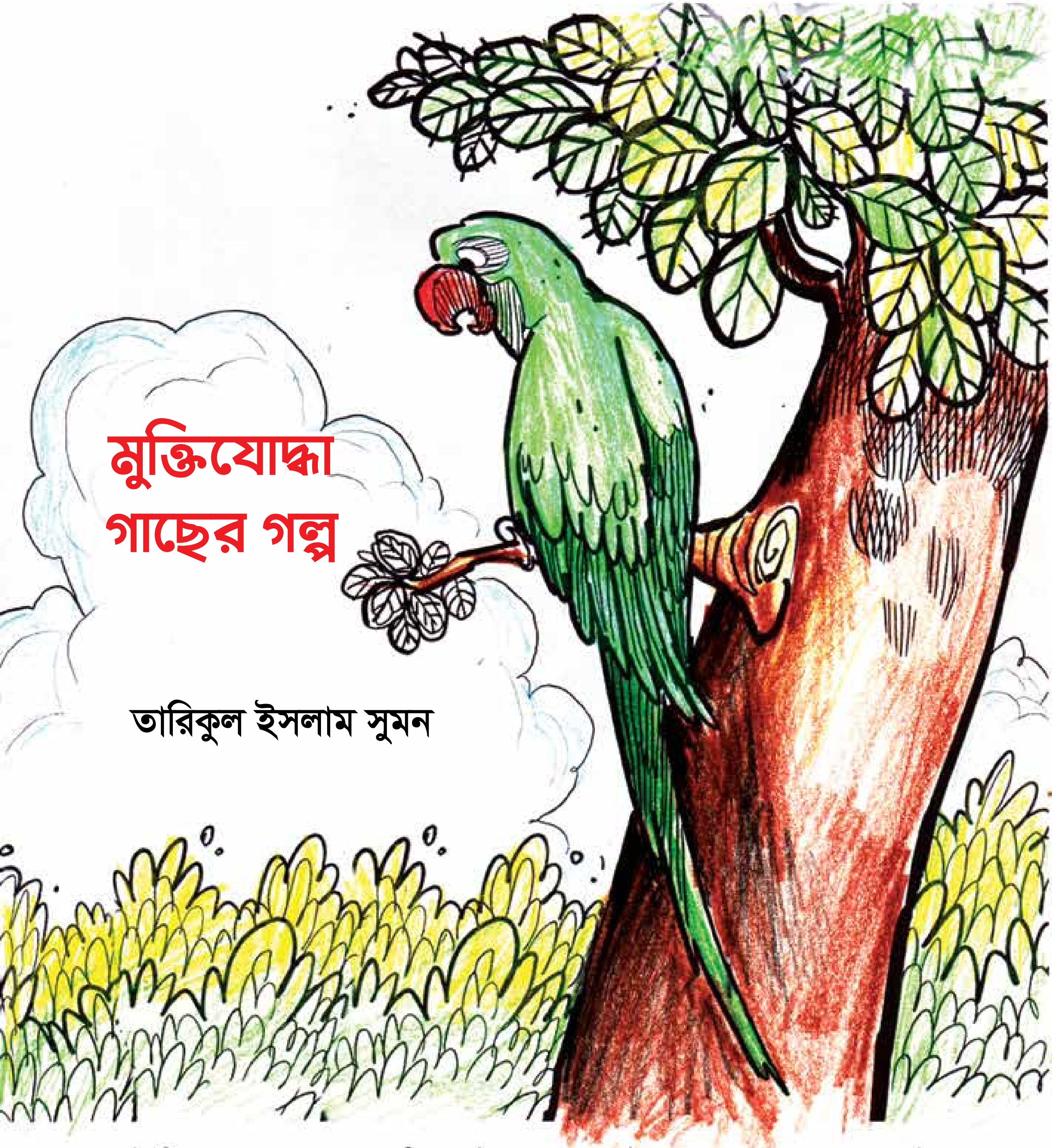

মুক্তিযোদ্ধা গাছের গল্প

তারিকুল ইসলাম সুমন

এতটা নিরাপদ বাসা আর হয়! ঝড়বৃষ্টিতে একটুও ভেজার ভয় নেই। ডাল ভেঙে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। বাসার মুখটা ছোটো হওয়ায় সহজে কেউ বুঝতেই পারে না যে ভেতরটা এত সুন্দর। দুষ্টু ছেলের দল পাখির ছানা খুঁজতে আসে, মাঝেমধ্যে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় তবে নাগালে পায় না। সেঁকুন গাছের কোটরের এই বাসায় ডিম ফুটে বেরিয়েছে সবুজ টিয়া পাখির চার চারটি ছানা। তুলতুলে দুলদুলে কী নাদুসনুদুস ছানাগুলো!

সাতসকালেই মা ও বাবা টিয়াপাখি বেরিয়ে পড়ে খাবার খুঁজতে। গাছপালা কমে যাওয়ায় আজকাল ঠিকমতো খাবার পাওয়া যায় না। মাঝেমধ্যে অনেক দূরেও যেতে হয়। একটু পর পর মা টিয়া মুখে করে খাবার নিয়ে বাসায় ফেরে। বড়ো, মেজো, সেজো ও ছটুকে পালা করে ঠোঁটে গুঁজে দেয় খাবার। কী সুন্দর সুন্দর খাবার! পাকা কলা, সূর্যমুখী ফুলের বীজ আর লাল টুকটুকে মরিচ খেতে কতই না মজা! এমন সব খাবার পেয়ে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে সবাই। এইত সবার গায়ে নরম পশম আর ডানায় গজিয়েছে নরম পালক। সবাই এখন কমবেশি কথাও বলতে শিখেছে! বাসায় এখন চিউচিউ করে কথা বলতে শোনা যায়। টিয়া ছানাদের কথা।

আজকাল গর্তের বাইরে মুখ বের করে তাকিয়ে থাকে টিয়া ছানাগুলো। রাস্তার দু'পাশে আছে নানান গাছ। আম, সুপারি ও নারকেল গাছের ছড়াছড়ি। পাশের মেহগনি ডালের বাসায় চুপচাপ বসে থাকা দুটি ঘুঘুর ছানাকে দেখছিল ছটু। ভাবলো ছটু, ইশ! রোদ-বৃষ্টিতে খুব কষ্ট হয় ওদের। আমদের বাসাটি কতই না ভালো। আচ্ছা, কে বানিয়েছিল আমাদের এই বাসাটি? নিশ্চয়ই কাঠঠোকরা দাদু হবে। মাকে উড়ে আসতে দেখে টুপ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ছটু।

বাচ্চাদের খাওয়া শেষ হলে বিশ্রাম নিচ্ছিল মা টিয়া। চোখ বুজে ঝিমাচ্ছিল। কী যেন কী ভেবে মাকে আচমকা এক প্রশ্ন করে বসল,

-আচ্ছা মা, আমাদের বাসাটি কে বানিয়েছিল?

-অনেক পুরাতন বাসা, বলতে পারবো না বাবা।

-বাবা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

-হয়ত-বা, তবে গাছ দাদু নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। চোখ বুজে উত্তর দিলো মা টিয়া পাখি।

-হুমমম...কয়েকবার মাথা নাড়লো টিয়া ছানা।

কয়েকদিন পরের এক ঝলমলে বিকেল। এই প্রথম বাসা থেকে বাইরে বেরিয়েছে টিয়া ছানাগুলো। বের তো হতেই হবে, উড়তে শিখতে হবো না? এ ডাল থেকে ও ডালে গিয়েই হাঁপিয়ে উঠছে ছানাগুলো! উঁচু একটা ডালে মায়ের পাশে বসে জিরাচ্ছিল ছানারা।

ছোট্ট নরম ডানা, এত কী আর উড়তে পারে! হঠাৎ কি যেন খেয়াল হলো ছোট্ট ছানা ছটুর। মাকে বলেই ফেলল,

-মা মা, গাছ দাদুর কাছে শোনো না, কে বানিয়েছিল আমাদের বাসাটি।

-আহ, তোর যন্ত্রণায় আর পারা যায় না। এসব জেনে কী হবে শুনি? একটু বিরক্তির সুরেই বলল মা টিয়া পাখি।

-এমনিতেই মনে হয়েছিল তাই বললাম।

মৃদু বাতাসে শিরশির করে কেঁপে উঠল সেঁকুন গাছের পাতা। সেঁকুন গাছ এতক্ষণ শুনছিল সবকিছু। এবার মুখ খুলল সে,

-আরে আরে সবুজ টিয়া, অবুঝ ছানাকে ওভাবে বকছ কেন? এই উঁচু ডালের এ পাশটায় এসে একটু বসো তো। আমি তোমাকে বলছি, তোমার মায়ের আর কদিন বা বয়স।

-শোনো দাদু, তখন ছিল আষাঢ় মাস। আমি তখন চারাগাছ। একদিন বাজারে এসে বিক্রি হলাম। ছনু মিয়া নামের একটি ছেলে আমাকে কিনে নিয়ে এল বাড়িতে। অবশ্য আমার সাথে আম, জাম, লেবুসহ কয়েকটি চারাও ছিল। এক বৃষ্টির দিন আমাকে রোপণ করল এই এখানে। কয়েকদিনের মধ্যে আমি গজিয়ে দিলাম নতুন শিকড় ও পাতা। ঠিক ছয় বছর পর আমি খানিকটা বড়ো হলাম। ঝুপড়ি হয়ে উঠল আমার মাথার ডালপালা। কিছু কিছু পাখি এসে বসত আমার ডালে, গান শোনাতো।

এই যে আজকের বাংলাদেশ নামের সুন্দর দেশটা, এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান। অন্যটি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান। সে অ-নে-ক আগের কথা। এইত মনে পড়েছে, সালটা ছিল উনিশশত একাত্তর সাল। পূর্ব পাকিস্তান তখন স্বাধীনতার জন্য তুমুল যুদ্ধ করছে। করবে না কেন, ওরা যে এদেশের মানুষের সাথে বড্ড অন্যায় করেছিল। সবদিক দিয়ে অবিচার ও নির্যাতন করত এখানকার মানুষের সাথে। প্রথমদিকে রাজধানী ও বড়ো বড়ো শহরে শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল সব জেলার গ্রামগঞ্জে। এই রাস্তা দিয়ে কত যে খাকি উর্দি পরা মিলিটারি যেতে দেখেছি। রাতে এসে ওরা মুক্তিবাহিনীর লোকদের খুঁজত, না পেলে মানুষের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতো। জীপে তুলে নিয়ে যেত বৃদ্ধ, যুবক ও নারীদের। মানুষের গরু-ছাগল পর্যন্ত ওরা ধরে নিতো। ওদের এমন কাজে সহযোগিতা করত এদেশের কিছু রাজাকার ও আলবদর।

সেদিন ঠিক দুপুর। হঠাৎ কয়েকজন পাকানো গোঁফওয়ালা মিলিটারি এল এখানে। একটু পর আরও কিছু সদস্য এল, এক রাজাকারও এল। সাথে করে ধরে নিয়ে এল কিশোর ছেলে ছনুকেও। সে কি হুমকি ধামকি। ভীষণ চিৎকার করে বলতে লাগল ওদের কমান্ডার,

- বল, মুক্তি ফৌজকা আস্তানা কাহা। জলদি বাতা, নইলে মাথার খুলি উপড়ে দেবো।

ছনু তো একদম চুপ। পায়ের কালো বুট দিয়ে মাটির সাথে মাথাটা চেপে ধরল কমান্ডার। তবুও চুপ ছনু। শেষে রেগেমেগে বলেই ফেলল,

-আমি জানি না, জানলেও তোদের বলতাম না শয়তান।

এবার ওই রাজাকার এসে কমান্ডারের কানে কী যেন বলে গেল। ব্যাস, আমার শরীরের সাথে ছনুকে বেঁধে ফেলল এক সিপাহি। এবার রাইফেল উঁচু করে ককিং হ্যান্ডেল টেনে তাক করল ছনুর বুকে। ট্রিগারে চাপ দিতেই দুম করে শব্দ হলো। ছনুর বুক ভেদ করে বুলেট এসে ঢুকল আমার শরীরেও। আমার শরীরের মাঝামাঝি এসে থেকে গেল বুলেটটি। ধীরে ধীরে আমার শরীরেও পচন শুরু হলো, নানান পোকা এসে বাস করতে থাকল। কাঠঠোকরা এসে ঠোকর দিয়ে দিয়ে তৈরি করল এমন গর্ত। এত এত বছরে কত যে পাখি এসে বাস করছে এখানে! অবশেষে একদিন যুদ্ধ শেষ হলো, মুক্ত হলো এই দেশ। বাংলাদেশ।

গল্প শুনতে শুনতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বাসা থেকে মুখ বের করে ডাক দিলো মা টিয়া। রাত হয়ে এল, ঘুমাতে হবে না ছটু? হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছি মা। ডানা দাপিয়ে টা টা দিয়ে ঘরে ফিরল টিয়াদের ছোট্ট ছানা ছটু। ❑

শিশুসাহিত্যিক

ধন্য কিশোর

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে গোপালগঞ্জ শহর পর্যন্ত মানুষের সুখে-দুঃখে যে সবার আগে পাশে এসে দাঁড়ান সেই দুরন্ত কিশোরটিই মুজিব। ডাকনাম খোকা। পূর্ণ নাম শেখ মুজিবুর রহমান। কেউ কেউ শেখ মুজিবরও বলেন।

আমরা বাঙালিরা আসলে ঝগড়াপ্রিয় মানুষ । একটু এদিক সেদিক হলেই অর্থাৎ পান থেকে চুন খসলেই আমরা এক তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলি। শুধু তাই নয়, আমরা ঝগড়া থামাতে যাই না, লাগাতে যাই। আবার ঝগড়া থামাতে গিয়ে নিজের উপরে পঞ্চাতি কিলঘুষি পড়ার ভয় ও সম্ভাবনা থাকে। তবে দর্শক সাড়িতে থেকে ঝগড়া দেখতে আমরা খুব পছন্দ করি। পারলে ঝগড়াটে উভয় গ্রুপকে আরও ঝগড়ার জন্য এমন কোনো কথা বলে উসকে দিতেও কার্পণ্যবোধ করি না। কিন্তু এসবের ব্যতিক্রম একটি ছেলেই আছে যে ঝগড়াঝাঁটি অনায়াসে মিটিয়ে দিতে পারে। তিনি শেখ মুজিব। ঢিঙঢিঙে লম্বা গড়নের এ অসীম সাহসী কিশোরটি কিলঘুষি পিঠে পড়বে কিনা তা ভাবে না, বা তোয়াক্কা করে না কখনও।

দু'হাতে ভিড় ঠেলে ঝগড়াস্থলে প্রবেশ করে প্রথমে দু'পক্ষকে ঝগড়া থেকে সরানোর চেষ্টা করে, পরে জনসমক্ষে ন্যায়ের পক্ষে রায় দিয়ে দেয়। এবং সবাই

তা মেনেও নেয়। তিনি উপস্থিত থাকলে ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার পাবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। পুলিশ ডাকার প্রয়োজন পড়ে না। মুজিব এখন মিশন স্কুলের ছাত্র। খেলার দলেও তাঁকে নিয়ে সবার টানাটানি। ফুটবল খেলার কথা বলছিলাম। সে যে দলে থাকবে সে দলের বিজয় নিশ্চিত। মিশন স্কুলের দলের খেলোয়াড়রা মুজিবকে ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিলো। সেরা খেলোয়াড় দল গোপালগঞ্জের অফিসার্স ক্লাবও মুজিবের দলের কাছে বারবার হার মানতে শুরু করল।

সাঁতারেও শেখ মুজিব সবার সেরা। নিজ গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাইগার নদী ছাড়াও মধুমতী নদীতে কতবার সাঁতরেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

কিশোর মুজিব মানবতাবাদী চিন্তাধারা সবসময় পোষণ করে। কারও দুঃখ-কষ্ট সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাঁর কান্না আসে। কোনো গরিব লোকের গায়ে কোনো পোশাক না থাকলে তিনি নিজের গায়ের পাঞ্জাবি বা শার্টটি পরিয়ে দিয়ে আসেন। শীতের দিনে কোনো অসহায় শিশু বা বৃদ্ধ লোকের গায়ে শীতবস্ত্র না থাকলে নিজের চাদরটিই দিয়ে দেন। রোদে বা বৃষ্টিতে কোনো দীনজনের ছাতা না থাকলে নিজের নতুন ছাতাটি দিতে কার্পণ্য করে না। কোনো সহপাঠীর বই না থাকলে নিজের বইটিই তাকে দান করে দেন। কোনো ভিখারি দেখলে তাঁর মন গলে যায়। ভিক্ষা চাইলে পকেটে যা আছে একসাথে সব দিয়ে আসেন। অবশ্য তাঁর এ ধরনের উদার ও মানবিক কাজের জন্য মা-বাবার কাছে কোনোদিন কৈফিয়ত দিতে হয়নি মুজিবকে। বরং মা-বাবা তাঁকে এ বিষয়ে আরও উৎসাহিত করতেন।

শুধু তাই নয়। তাঁর উচ্চশিক্ষিত গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদ সাহেব 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করে সমাজের সেবামূলক কাজ শুরু করলে মুজিবও আনন্দচিত্তে তাতে শরীক হন। সমিতির সদস্যদের প্রধান কাজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করে যে চাল সংগ্রহ হয়, তা বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো।

এই তো সেদিন, যক্ষ্মা রোগে গৃহশিক্ষক আবদুল হামিদ মারা গেলে এই সমিতি পরিচালনার ভার কিশোর মুজিব মাথা পেতে নিলেন। এখন তাঁর নেতৃত্বেই মুষ্টিভিক্ষার মাধ্যমে চাল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা হয়। পরে সে টাকা দিয়ে গরিব, অসহায়, মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ বাবদ ব্যয় করা হয়।

কয়েকদিন পরেই বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আসবেন গোপালগঞ্জে বিরাট এক জনসভায়। জনসভা শেষে শ্রমমন্ত্রী মিশন স্কুল পরিদর্শন করবেন। সে উপলক্ষ্যে মিশন স্কুলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করলেন শেখ মুজিব তাঁর নেতৃত্বে।

ওইদিন বিশাল জনসভা হলো গোপালগঞ্জে। সভা শেষ করে মুজিবের মিশন স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব। স্কুলের সেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে মুজিব শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্কুলের যাবতীয় সমস্যার কথা তুলে ধরলেন এবং তা নিরসনে বিভিন্ন দাবিদাওয়া সুন্দর করে মন্ত্রীর সমীপে পেশ করলেন। বলা যায়, বাধ্য হয়ে মন্ত্রী মুজিবের সবগুলো দাবির যৌক্তিকতা থাকায় অচিরেই পূরণ করবেন বলে আশ্বস্ত করলেন। এভাবেই মুজিব মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে দাবি আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। তাঁর দুর্বার সাহস ও নেতৃত্বদানের সক্ষমতা দেখে শ্রমমন্ত্রী শুধু অবাক ও বিমুগ্ধই হলেন না, তিনি শেখ মুজিবের নাম-ঠিকানা নিয়েই তবে চলে গেলেন। মন্ত্রী হয়ত মনে মনে ভাবলেন এই ছেলেটিই তাঁর দলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। হয়ত একদিন তাঁর পরাধীন স্বদেশ স্বাধীন হবে বলে তিনি মনে করছিলেন।

শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মুজিবের দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে স্কুলের ছাত্র- শিক্ষক সবাই মুজিবকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। ❑

কবি, ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক

ছবির মানুষ

খায়রুল আলম রাজু

একটা নদী, ছোট্ট নদী
ছুটছে এঁকেবেঁকে,
আমার বাড়ির ছোট্ট খুকু
খাতায় রাখে এঁকে।

ধানের জমি, মাঠের উপর
আকাশটাকে রেখে
একটুখানি সবুজ নিলো
সবুজ পাতার থেকে...

পাখির থেকে সুর নিলো সে
পাহাড় থেকে মায়া
রোদের থেকে তেজ নিলো আর
গাছের থেকে ছায়া।

মেঘের থেকেও বাদ যায়নি
পাঞ্জাবি নেয় সাদা
রাতের থেকে একটা কালো
চশমা নিলো দাদা।

কোট নিলো সে ঘন কালো
সঙ্গে শিশুর হাসি;
ঠোঁটের উপর কথার মায়া
আপন যে তাঁর চাষি...

সকল কিছু নেওয়ার পরে
দেখ তাকিয়ে দেখ
ছবির মানুষ জাতির পিতা
নামের আগে শেখ...

আগুনঝরা মার্চ

নুসরাত জাহান

মার্চ মাস এলেই মনে পড়ে যায়
বঙ্গবন্ধুর সেই ৭ই মার্চের অমোঘ বাণী।
যে বাণীকে কেন্দ্র করেই আমরা পেয়েছি
মহান এক স্বাধীন বাংলাদেশ।
যা ছিল বাঙালির আজন্ম লালিত স্বপ্ন
সেই স্বপ্নেরই স্বার্থক রূপকার।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১৭ই মার্চের শুভ জন্মদিন।
বঙ্গবন্ধুকে জানাই হাজারো রক্তিম সালাম
তিনি হাজারো বছর বেঁচে থাকুন।
আমাদের হৃদয়ের গহীনে
জন্মদিনের সেই শুভ কামনায়।

জাতির পিতা

মিশকাত উজ্জ্বল

সাদা পাঞ্জাবি, কালো চশমা
অতি সাধারণ বেশ।
সদালাপী, সদয় সর্বময়
নেই অহমের লেশ।

যার ইশারায় জাগল জাতি
চেতনা হলো সজীব ।
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
মহান নেতা মুজিব।

বিশ্ব-ইতিহাসে চির অম্লান
আগুনঝরা ভাষণ ।
কাঁপিয়ে দিল অত্যাচারী
ইয়াহিয়ার আসন।

নিপীড়িত বাঙালিদের তিনি
বাসতেন প্রাণাধিক ভালো।
তাঁর হাত ধরেই এসেছে
স্বাধীনতার আলো।

অভিবাদন

পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য

চোখের জলে ভিজিয়েছি মাটি
চিত্ত কুঁড়ে কুঁড়ে মেরেছে আমায়
স্বাধীনতা তোমার সাধ
তোমাকে পাওয়ার আশায়।

কুৎসা নিন্দা অপবাদে
জেগে ওঠে সবাই মিলে
প্রতিবাদী মানবজাতি
হায়নাদের তাড়িয়ে দিলে।

স্বাধীনতাকে পুষ্প দিয়ে
আমরা করেছি বরণ
শাশ্বত স্বাধীনতা
তোমাকে জানাই অভিবাদন।

ঐতিহাসিক উদ্যান

মো. কবির হোসেন

পূর্বের নাম ছিল রমনা রেসকোর্স ময়দান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর রমনা রেসকোর্স নাম পরিবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান রাখা হয়। আর দশটি উদ্যানের মতো সাধারণ উদ্যান এটি নয়। এর আছে অসাধারণ সমৃদ্ধ এক ইতিহাস। দেশে দেশে অনেক পার্ক আছে, কিন্তু একটি জাতির ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় ধরে রাখা অসংখ্য ঘটনার সাক্ষী এমন উদ্যান এই পৃথিবীতে আর আছে কি না আমার জানা নেই, থাকলেও বিরল।

জাতীয় স্মৃতিচিহ্নও হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এখনো স্মরণীয় হয়ে আছে। এই উদ্যানেই টুঙ্গিপাড়ার খোকা, গণমানুষের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। এখানেই উচ্চারিত হয়েছিল স্বাধীনতার সেই অমোঘ বাণী, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। এই ভাষণ জাতিকে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই ভাষণ শোনার জন্য জনসমুদ্রে পরিণত হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। দেশের শিক্ষাবিদরা বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী ৭ই মার্চের ভাষণটিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাঙালি জাতির শপথ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো মহাকাব্যিক ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এ উদ্যানেই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে মিত্র বাহিনীর কাছে। রেসকোর্স ময়দানের অদূরে অবস্থিত তৎকালীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের

স্থান হিসেবে প্রথমে নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে আত্মসমর্পণের জন্য এই মাঠটি নির্বাচন করা হয়। এই দিনটি আমাদের বিজয় দিবস।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশে ফিরে এখানেই বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন কান্নায় ভেঙে পড়া আবেগঘন ভাষণ। এছাড়া এই উদ্যানে ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বক্তব্য রাখেন। ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ হাতে নারকেল গাছের চারা লাগিয়ে এই রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রুপান্তরিত করেন, বন্ধ করেন ঘোড়দৌড়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, তাই একে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৯৯ সালে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপন করা হয়।

তার পাশেই যেখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিল সেখানে গড়ে তোলা হয়েছে 'স্বাধীনতা স্তম্ভ'। স্বাধীনতা স্তম্ভ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ জনতার দেয়াল নামে ২৭৩ ফুট দীর্ঘ একটি দেয়ালচিত্র। এটি ইতিহাসভিত্তিক টেরাকোটার পৃথিবীর দীর্ঘতম ম্যুরাল। এর বিষয়বস্তু ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। ম্যুরালের নিচের অংশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে স্বাধীনতা জাদুঘর। এ ছাড়া এই উদ্যানে রয়েছে একটি কৃত্রিম লেক। বৃহত্তম মুক্তমঞ্চ যেটি ২০১১ সালের ৭ই মার্চ থেকে বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠানের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। ❑

সাংবাদিক, দৈনিক ভোরের কাগজ

ছোটোদের লেখা

কেমন করে পেলাম

সাবাহ্ নূর তৌফিকা

শিশু দিবস শিশুদের জন্য একটি স্মরণীয় দিন। তুরস্কের অধিবাসীরা শিশু দিবস প্রথম পালন করে ১৯২০ সালের ২৩শে এপ্রিল। ১৯২৫ সালে জেনেভায় বিশ্ব শিশু কল্যাণ সম্মেলনে প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়। ১৯৫০ সাল থেকে বেশিরভাগ কমিউনিস্ট এবং পোস্ট-কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ১লা জুন 'আন্তর্জাতিক শিশু দিবস' উদযাপিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কতৃ́ক শিশু অধিকারের ঘোষণাকে স্মরণ করার জন্য 'বিশ্ব শিশু দিবস' পালন করা হয়। ১১ই অক্টোবর সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস' পালিত হয়।

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বছরে একাধিকবার বিভিন্ন নামে শিশু দিবস পালন করা হয়। এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলো নিজেদের মতো করে পালন করে জাতীয় শিশু দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুনের দ্বিতীয় রবিবার পালন করা হয় শিশু দিবস। আবার পাকিস্তানে শিশু দিবস হলো ১লা জুলাই, ৪ঠা এপ্রিল শিশু দিবস উদযাপিত হয় চীনে। অন্যদিকে ব্রিটেনে শিশু দিবস পালন করা হয় ৩০শে আগস্ট, জাপানে ৫ই মে, পশ্চিম জার্মানিতে ২০শে সেপ্টেম্বর। ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন ১৪ই নভেম্বরকে জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করে ১৯৬৭ সাল থেকে পালন করে আসছে। তবে সব দেশেই শিশু দিবস পালনের উদ্দেশ্য একটাই, দেশের শিশুদের অধিকার ও তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফের একবার সচেতনতার বার্তা দেওয়া।

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব শিশু দিবস পালন হলেও 'জাতীয় শিশু দিবস' ছিল না। ১৯৯৪ সালের ১৭ই মার্চ বেসরকারিভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে জাতীয় শিশু-কিশোর দিবস হিসেবে পালন করে 'বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা' নামক একটি সংগঠন। এর আগে ১৯৯৩ সালে দিবসটির প্রস্তাব করেন ড. নীলিমা ইব্রাহিম। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর

ভালোবাসার কারণেই শেখ হাসিনার সরকার (১৯৯৬-২০০১) ১৯৯৬ সালে 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে ১৭ই মার্চকে 'জাতীয় শিশু দিবস' ঘোষণা করে। ১৯৯৭ সালের ১৭ই মার্চ থেকে দিনটি সরকারিভাবে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রথমে দিনটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা না করলেও পরবর্তী সময়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

কোনো বিশেষ ঘটনা বা আনন্দের দিনকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য সবচে' বেশি আনন্দের দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। যার জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তাছাড়া শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ ছিল অপরিসীম। তিনি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ও খেলতে পছন্দ করতেন। বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ গড়ার নেতৃত্ব দিবে। প্রিয় বাংলাদেশকে শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করার নতুন শপথ নিতেই বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বাংলাদেশে পালিত হয় জাতীয় শিশু দিবস। শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন গৌরবের। তাঁর এ গৌরবের ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর মাঝে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠুক। শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক দৃঢ়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য-পুষ্টির দিকে নজর দিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিশ্চিত হোক–এটিই শিশু দিবসের প্রত্যয়। ❑

ষষ্ঠ শ্রেণি, সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

নাফিসা তাসনিম স্নেহা, দ্বিতীয় শ্রেণি, বারহাট্টা সরকারি মডেল স্কুল, বারহাট্টা, নেত্রকোণা

স্বাধীনতা আমার

সাবিকুন নাহার প্রীতি

স্বাধীনতা আমার লাল-সবুজের পতাকা
স্বাধীনতা আমার নিজ ভূমে থাকা
স্বাধীনতা আমার বীর শহিদের ছবি
স্বাধীনতা আমার যুদ্ব জয়ের জীবন লভি।

স্বাধীনতা আমার মানচিত্র মুজিব নামে আঁকা
স্বাধীনতা আমার স্বদেশভূমি রক্তে-রঙে মাখা
স্বাধীনতা আমার জয় বাংলা–বাংলার জয়
স্বাধীনতা চিরকালের নেই তো কোনো ক্ষয়।

অষ্টম শ্রেণি, শাহাজাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
কোম্পানীগঞ্জ

স্বাধীনতা

মাহফুজ আনাম

স্বাধীনতা আমার সংগ্রামী চেতনা
আবেগ আর ভালোবাসার নাম
স্বাধীনতা লাল- সবুজের পতাকা
যেখানে আমার স্বাধীনতার কথা লেখা।

মুক্তির আশায় ভাঙল যারা শিকল
আনল যারা স্বাধীনতা
আমরা তাদের ভুলিনি
ভুলব না কখনো

লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে
অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে
নয় মাস প্রতীক্ষার পর
আমরা আজ স্বাধীন

দশম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রেষ্ঠ বাঙালি

লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

জন্ম হলো একটি শিশুর
খোকা তাঁর নাম
স্থানটা ছিল গোপালগঞ্জের
টুঙ্গিপাড়া গ্রাম।

দেশের জন্য কাজ করেছেন
নিজ পরিবার ফেলে,
বারে বারে অকারণেই
গেছেন তিনি জেলে।

তাঁর কথাতেই সবাই তখন
রাখল জীবন বাজি
দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন দেখে
যুদ্ধে যেতে রাজি

তাঁর কারণেই স্বাধীন হলো
আমার জন্মভূমি
সত্যিই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা তুমি।

দশম শ্রেণি, হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

সেই ভাষণ

মেশকাউল জান্নাত বীথি

৭ই মার্চের ভাষণে
শুরু হয় স্বাধীনতার যুদ্ধ
এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
ছাত্র-জনতা আবাল বৃদ্ধ।

মুক্তির আত্মপ্রত্যয়ে শিকল ভেঙে
আনলো যারা স্বাধীনতা
থাকবে তারা অমলিন হয়ে
আমাদের হৃদয়ে গাথা।

অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মানতে হবে যেসব আইন

কামরুন নাহার কণা

জাতীয় পতাকা হচ্ছে একটি দেশের স্বাধীনতার প্রতীক,একটি জাতির পরিচয়। পৃথিবীর সব দেশেরই জাতীয় পতাকার একটি ইতিহাস রয়েছে। তবে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস অনেক ত্যাগের অনেক আবেগের। পাকিস্তানিরা রাইফেল তাক করে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলতে বলেছে। সেই মুহূর্তে ওপাশের মানুষটি মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে বুকের রক্ত দিয়ে জাতীয় পতাকার লাল বৃত্ত অঙ্কন করে বলেছেন ‘জয় বাংলা’। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এটি একটি অহরহ ঘটনা যা বহুবার ঘটেছে। আমাদের জাতীয় পতাকা এতটাই শক্তিশালী যে, মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও শেষ আশ্রয় ছিল লাল-সবুজ পতাকা! লাল-সবুজে মিশে রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এ পতাকা পুরো দেশকে ধারণ করেছে তার বুকে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাসের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জড়িয়ে রয়েছে বলেই এর প্রতি আমাদের আবেগটাও অন্যরকম।

আমরা জানি জাতীয় দিবসগুলোতে পতাকা উত্তোলন করা যায়। তবে কোন কোন দিবসে এবং কীভাবে পতাকা উত্তোলন করতে হয়,তা অনেকেই জানি না। যারা পতাকা তৈরি করেন তারাও সবাই সঠিক জানেন না পতাকার যে একটা আইন রয়েছে এবং সে আইনে পতাকার আকার ও রঙের ব্যাপারে কী বলা হয়েছে তাই অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়ে যায়। জাতীয় পতাকার বিধি বিধান সম্পর্কে সবার জানা দরকার।

১৯৭২ সালে প্রণীত ৩ ধারায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা অনুযায়ী জাতীয় পতাকার মাপ ও রং কেমন হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আমাদের জাতীয় পতাকার অনুপাত- ১০:৬ বা ৫:৩। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের আয়তাকার ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ রঙের মাঝে লাল বৃত্ত। ধরা যাক, পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট। তাহলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট। লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২ ফুট। পতাকার দৈর্ঘ্যর বিশ ভাগের বাম দিকের নয় ভাগের শেষ বিন্দুর ওপর অঙ্কিত লম্ব এবং প্রস্থের দিকে মাঝখান বরাবর অঙ্কিত সরল রেখার ছেদ বিন্দু হলো লাল বৃত্তের কেন্দ্র। পতাকার লাল বৃত্তের মাপ- পতাকার ৫ ভাগের ১ অংশ বা বৃত্তটি দৈর্ঘ্যর এক-পঞ্চমাংশ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে। ভবনে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো- ১০ বাই ৬ ফুট (৩.০ বাই ১.৮ মিটার), ৫ বাই ৩ ফুট (১.৫২ বাই ০.৯১ মিটার), ২.৫ বাই ১.৫ ফুট (৭৬০ বাই ৪৬০ মিলিমিটার) ইত্যাদি। জাতীয় পতাকায় গাঢ় সবুজ রং বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি ও তারুণ্যের প্রতীক। আর মাঝের লাল বৃত্তটি উদীয়মান সূর্যের প্রতীক ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের দেওয়া রক্ত ও আত্মত্যাগকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ পতাকা বিধি, ১৯৭২-এর ৪ ধারায় কোন কোন দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। যেমন- আমাদের মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মদিনে (ঈদে মিলাদুন্নবী), ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে। এ ছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস, জাতীয় শোক দিবস ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে-কোনো দিবসে পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হবে। অর্ধনমিত পতাকা উত্তোলনের নিয়ম হলো, অর্ধনমিত অবস্থায় উত্তোলনের সময় পতাকাটি

পুরোপুরি উত্তোলন করে অর্ধনমিত অবস্থানে আনতে হবে। ঠিক একইভাবে পতাকা নামানোর সময়ও পতাকাটি শীর্ষে উত্তোলন করে তারপর নামাতে হবে।

জাতীয় পতাকা সব জায়গায় প্রদর্শন করা যায় না। জাতীয় পতাকা প্রদর্শনের একটা নিয়ম রয়েছে। ইচ্ছে করলেই যে কেউ গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারেন না। কেননা আইনে বলা হয়েছে, কোনো অবস্থায়ই গাড়ি কিংবা কোনো যান, রেল কিংবা নৌকার খোলে, উপরিভাগে বা পেছনে পতাকা ওড়ানো যাবে না। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও দফতর, যেমন- রাষ্ট্রপতির ভবন, প্রধানমন্ত্রীর ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময় এবং কিছু নির্ধারিত ভবনসমূহে সব কর্মদিবসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। এসব ক্ষেত্রে শুধু সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকা উত্তোলিত রাখতে হবে। এটাই নিয়ম।

তবে বিশেষ কারণে রাতে ভবনসমূহে পতাকা উত্তোলিত রাখা যেতে পারে। যেমন- সংসদের রাতের অধিবেশন, রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীগণের শপথ অনুষ্ঠান চলাকালীন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে, নৌযানে ও বিমানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে। এ ছাড়া স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতা, মন্ত্রী সমমর্যাদার ব্যক্তি, বিদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনের অফিস ও কনস্যুলার পোস্টসমূহে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হয়। বিদেশে বাংলাদেশি মিশনের প্রধানের গাড়িতে ও তাদের নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, উপমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজধানীর বাইরে ভ্রমণকালে গাড়িতে ও নৌযানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের পতাকার ওপরে অন্য কোনো পতাকা ওড়ানো যাবে না। অন্য দেশের পতাকার সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হলে প্রথমে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। নামানোর সময়ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শেষে নামাতে হবে।

মিছিলেও পতাকা বহনের বিধান আছে। যেমন, পতাকা মিছিলের কেন্দ্রে অথবা মিছিলের সামনের সারির ডানদিকে বহন করতে হয়। আবার জাতীয় পতাকার ওপর কোনো কিছু লেখা বা আঁকা যাবে না অথবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে কোনো চিহ্নও দেয়া যাবে না। এমনকি জাতীয় পতাকাকে গায়ের পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং গায়ে জড়িয়েও রাখা যাবে না। পতাকা উত্তোলন ও নামানোর সময় প্যারেড ও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত সবাই পতাকার দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা উত্তোলনের সময় একসঙ্গে জাতীয় সংগীত গাইতে হবে অথবা বাজাতে হবে। পতাকা ব্যবহারের অনুপযোগী হলে তা মর্যাদাপূর্ণভাবে সমাধিস্থ করে নিষ্পত্তি করতে হবে।

কবরস্থানে জাতীয় পতাকা নিচু করা যাবে না, পতাকা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে নিম্নমুখী করা যাবে না। পতাকা কখনোই সমতলে বহন করা যাবে না, কোনো কিছুর আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদা বা আনুষ্ঠানিকতাসহ সমাধিস্থ করা হলে তার শবযানে পতাকা আচ্ছাদনের অনুমোদন করা যেতে পারে। কোনো কিছু গ্রহণ, ধারণ, বহন বা বিলি করার ক্ষেত্রে পতাকা ব্যবহার করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননা করা বা জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে ওই ব্যক্তিকে ২০১০ সালের ২০শে জুলাই প্রণীত আইন অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা এক বছরের কারাদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

জাতীয় পতাকার অবমাননা করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা। স্বাধীন বাংলাদেশকে অস্বীকার করা। অনেক কষ্ট ও ত্যাগের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছেন। তাই জাতীয় পতাকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা আপনার, আমার, সবার নৈতিক দায়িত্ব।

বঙ্গবন্ধু অ্যাপ

‘বঙ্গবন্ধু অ্যাপ উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি শনিবার প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে দরবার টেকনোলজিস লিমিটেডের তৈরি অ্যাপটি উদ্‌বোধন করেন।

অ্যাপটি উদ্‌বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এতে জাতির পিতার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জানার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের মহান স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। বন্ধুরা চলো জেনে নেই কি কি আছে এই অ্যাপে।

বঙ্গবন্ধুর উক্তি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন বক্তব্যে থাকা বিশেষ উক্তিগুলোকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে ‘বঙ্গবন্ধুর উক্তি- The Quotes of Bangabandhu’ অ্যাপে। প্রথমে অ্যাপটিতে প্রবেশ করলে দেখা যাবে বাংলাদেশের মানচিত্রের একটি BDG• ডিজাইন। সেখানে তারুণ্যে, মাঠে ময়দানে, রাজনীতি, সংসদে ইত্যাদি বিভাগে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন উক্তি তুলে ধরা হয়েছে। অ্যাপটির ভাষা বাংলা।

বঙ্গবন্ধু অ্যালবাম

ছেলেবেলায় কিংবা তরুণ বয়সে বঙ্গবন্ধু দেখতে কেমন ছিলেন- এমন প্রশ্নের উত্তর দিবে ‘বঙ্গবন্ধু অ্যালবাম’। ছিমছাম BDG• ডিজাইনের অ্যাপটির একটা মজার দিক হলো ১০ টাকার নোটের ওপর অ্যাপটি ধরলে চালু হবে। আছে বঙ্গবন্ধুর ছবিগুলো নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ বেশ কিছু ছবি।

বঙ্গবন্ধুর জীবন

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে আরেকটি চমৎকার অ্যাপ হলো ‘Bangabandhu’। তরুণ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অ্যাপটি তৈরি করেছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। অ্যাপটির নতুন সংস্করণে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের রঙিন ভিডিওচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে।অ্যাপ্লিকেশনটির মূল মেন্যুতে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী, ভাষণ, সাক্ষাৎকার, চিঠি, ছবির গ্যালারি এবং বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের ছয়টি মেন্যু পাওয়া যাবে।

৭ই মার্চের ভাষণ

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার আহ্বানের জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিল বাঙালি জাতি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সেই অপেক্ষার অবসান ঘটায়। সেই ভাষণের নানা দিকের বিশ্লেষণ নিয়ে এই অ্যাপটি তৈরি করেছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। 7th March Speech Analysis নামের অ্যাপটিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ তো আছেই, আছে ভাষণটির ইংরেজি অনুবাদও। এ ছাড়া এই ভাষণের লিখিত রূপ পড়াও যাবে অ্যাপটিতে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

২০০৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা চারটি খাতা হঠাৎ করে তাঁর কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। অতি পুরনো খাতাগুলোর পাতা ছিল জীর্ণপ্রায় আর লেখাও প্রায় অস্পষ্ট। মূল্যবান সেই খাতাগুলো পাঠ করে জানা যায় এগুলোই বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী। সেটাই পরে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ হিসেবে প্রকাশিত হয়। সেই বইটি এখন অ্যাপ হিসেবে পাওয়া যাবে গুগল প্লেস্টোরে। পৃষ্ঠা অনুযায়ী বইটি পড়া যাবে। তবে বই থেকে কোনো লেখা কপি করা যাবে না।

প্রতিবেদন : সারিকা সানজানা

অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা

মাধ্যমিকের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। বৃহস্পতিবার ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে, যা ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৪ সালে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি) ভর্তিকৃত ও অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে ভর্তি সহায়তা দেওয়া হবে। ভর্তি সহায়তা পেতে শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে অবেদন করতে হবে।

ভর্তি সহায়তা পেতে শিক্ষার্থীদের ছবি, স্বাক্ষর, জন্মনিবন্ধন সনদ, অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশ থাকতে হবে। সরকারি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে বাবা-মা বা অভিভাবকদের কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রত্যয়ন বা সুপারিশ অবশ্যই লাগবে।

আরও বলা হয়েছে, সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীর সন্তান আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে মা-বাবা বা অভিভাবকের বার্ষিক আয় দুই লাখ টাকার কম হতে হবে।

শিক্ষার্থী ভর্তি সহায়তার জন্য নির্বাচিত হলে তার মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।আবেদনের চার থেকে ছয় মাস পর টাকা পাঠানো হবে।

পুষ্টিকর খাবার দিবে সরকার

দেশের দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকাগুলোর শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে ১৫০টি উপজেলার ১৮ থেকে ১৯ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫ লাখ সরকারি শিক্ষার্থীকে সপ্তাহে পাঁচদিন পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরকারি স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (ফেইজ-১) প্রকল্পের আওতায় এই খাবার বিতরণ করা হবে। তিন বছরের জন্য প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ৭৫৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের দুধ, ডিম, মৌসুমি ফল, কলা, ফর্টিফাইড বিস্কুট, কেক ও পাউরুটি দেওয়া হবে। সপ্তাহে পাঁচদিন এসব খাবার বিতরণের জন্য তিনটি ধাপে কর্মসূচির রোডম্যাপ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে প্রতিদিন দুধ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিদিন ডিম দেওয়া হবে। তৃতীয় ধাপে প্রতিদিন মৌসুমি ফল দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ এই প্রকল্পের আওতায় টিফিনে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার দিবে সরকার।

প্রতিবেদন : আনোয়ার হোসেন

আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক জয়

গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে ১৬ থেকে ১৯শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড ২০২৪। বাংলাদেশ দল এবারের ২৫তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে ৩টি স্বর্ণপদকসহ মোট ১৫টি পদক অর্জন করেছে । স্বর্ণপদক ছাড়াও ৬টি রৌপ্যপদক, ৪টি ব্রোঞ্জপদক ও ২টি টেকনিক্যাল পদক পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা। ২৬টি দেশের প্রায় ১ হাজার ৪০০ প্রতিযোগী এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রোবোটিকসের আন্তর্জাতিক এই উৎসবে বাংলাদেশ থেকে ১৬ সদস্যের দল অংশ নেন। ১৯শে জানুয়ারি এথেন্সের ফ্যালিরো কোস্টাল জোন অলিম্পিক কমপ্লেক্সে অলিম্পিয়াডের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ দলের পক্ষে ২৫তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক অর্জন করেছে রোবট ইন মুভি জুনিয়র গ্রুপে রোবোস্পারকার্স দলের জাইমা যাহিন ওয়ারা, রোবট ইন মুভি সিনিয়র গ্রুপে রোবো ইডিয়টস দলের নাশীতাত যাইনাহ্ রহমান, প্রপা হালদার ও মার্জিয়া আফিফা পৃথিবী এবং ক্রিয়েটিভ আইডিয়া সিনিয়র গ্রুপে জিরোথ দলের সদস্য মিসবাহ উদ্দিন ইনান।

প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক অর্জন করেছে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি জুনিয়র গ্রুপে টিম পাই দলের মাহরুজ মোহাম্মদ আয়মান, ফিজিক্যাল কম্পিউটিং জুনিয়র গ্রুপে রোবোস্পারকার্স দলের জাইমা যাহিন ওয়ারা, টিম পাই দলের সদস্য মাহরুজ মোহাম্মদ, রোবট ইন মুভি সিনিয়র গ্রুপে জিরোথ দলের মিসবাহ উদ্দিন ইনান ও সাদিয়া আক্তার স্বর্ণা, অ্যাফিসিয়েনাদোস দলের মাইশা সোবহান, সামিয়া মেহনাজ ও মাশকুর মালিক মোস্তফা এবং এআই অটোনমাস ড্রাইভিং সিনিয়র গ্রুপে এক্সফ্যানাটিক দলের মাহির তাজওয়ার চৌধুরী।

বাংলাদেশ দলের হয়ে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছে ক্রিয়েটিভ আইডিয়া জুনিয়র গ্রুপের রোবোস্পারকার্স দলের সদস্য জাইমা যাহিন ওয়ারা, ফিজিক্যাল কম্পিউটিং সিনিয়র গ্রুপে জিরোথ দলের সদস্য মিসবাহ উদ্দিন ইনান, এক্সফ্যানাটিক দলের সদস্য মাহির তাজওয়ার চৌধুরী ও ফাতিন আল হাবীব নাফিস এবং রোবট ইন মুভি সিনিয়র গ্রুপে টেক অটোক্র্যাটস দলের আন নাফিউ, নামিয়া রউজাত নুবালা ও রুবাইয়াত এইচ রহমান। এছাড়া বাংলাদেশ দলের পক্ষে টেকনিক্যাল পদক অর্জন করেছে ক্রিয়েটিভ ক্যাটাগরি সিনিয়র গ্রুপে অটোমেশন ৭১ দলের সদস্য সাদিয়া আক্তার স্বর্ণা এবং রোবো সোলো দলের সদস্য ফাতিন আল হাবীব নাফিস

বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াডের পৃষ্ঠপোষক ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বিজয়ীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

নৌযান প্রযুক্তি আবিষ্কার

নৌযান ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রযুক্তি আবিষ্কার করে সাড়া ফেলেছে ঢাকার শহীদ রমিজ উদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট করেজের ছাত্র মো. জুলহাস ইসলাম। তার উদ্ভাবিত এই আবিষ্কারের নাম দিয়েছে 'রক্ষক'। দীর্ঘ এক বছরের গবেষণায় ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সাত বারে সফলতা পেয়েছে খুদে এই শিক্ষার্থী। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে জমানো টাকা দিয়ে এটি উদ্ভাবন করেছে সে।

শিক্ষার্থী জুলহাস ইসলাম তার উদ্ভাবিত 'রক্ষক' নিয়ে বলেন, ডুবন্ত অবস্থায় কোনো জাহাজে পানি প্রবেশ করলে ওয়াটার পাম্প বা এয়ার বেলুনের সমন্বয়ে তৈরি এই 'রক্ষক' প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি অপসারণ করবে। এটাকে দুইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। একটি হলো, মানব নিয়ন্ত্রিত অন্যটি সেন্সর বা অটোমেটিক। আমি যেটা বানিয়েছি সেটা হলো মানব নিয়ন্ত্রিত। কোনো নৌযান পানি ডুবলে যে পরিমাণ পানি ডুকবে তখন ওয়াটার পাম্প চালু করলে পাইপের মাধ্যমে উপর দিয়ে পানি নিষ্কাশন করবে। আর নৌযানের নিচে দুই পাশে থাকা এয়ার বেলুন ফুলানোর মাধ্যমে নিচের থেকে চাপ সৃষ্টি করে নৌযানটিকে পানির উপরে ভাসমান রাখবে। আগে দেখা যেত খুব দ্রুত নৌযানগুলো ডুবে যেত, সেটা এয়ার বেলুনের কারণে অনেকক্ষণ ভাসমান থাকবে। এর মধ্যে উদ্ধারকারী দল এসে নৌযানের যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারবে।

জুলাহাস আরো বলেন, আর্থিক সহায়তা পেলে ১৫-২০ দিনের মধ্যে পুরো প্রযুক্তি সম্পূর্ণ করা যাবে। ৫০জন বিশিষ্ট দোতলা নৌযানে এটি ব্যবহারে সর্বনিম্নটা খরচ পড়বে ২৫–৩০ লাখ টাকা, মাঝামাঝিটা খরচ পড়বে ৩০-৪০ লাখ আর সবোর্চ্চটা ৪০-৫০ লাখ টাকা খরচ পড়বে। জুলাহাসের শিক্ষক ও সহপাঠীরা তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রারণে সরকারের সহায়তা কামনা করছেন।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

নারী ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

নেপালের কাঠমুন্ডুতে সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে টাইব্রেকারে ভারতকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ দল। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলের সমতায় শেষ হয় ম্যাচটি। প্রথমার্ধের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ, দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়িয়ে টাইব্রেকারে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ। ১০ই মার্চ সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হল বাংলাদেশ। রাউন্ড রবিন পর্বে এই ভারতের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জয় পেয়েছিল তারা।

টাইব্রেকারের প্রথম শট নেওয়া বাংলাদেশের সুরভী আকন্দ প্রীতি। তার শট ঠেকিয়ে দেয় ভারতের গোলরক্ষক। তবে ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শট ঠেকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের গোলরক্ষক ইয়ারজান দলকে খেলায় ফিরে আনেন। চতুর্থ শটে ভারত সমতায় ফেরে। পঞ্চম শটে বাংলাদেশকে এগিয়ে দেন সাথী মুন্ডা। টিকে থাকতে হলে শেষ শটে গোল করতেই হতো ভারতকে। তবে বাংলাদেশের গোলরক্ষক শেষ শট ঠেকিয়ে দেন। ফলে ৩-২ ব্যবধানে শিরোপা জিতে নেয় বাংলাদেশ।

ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। আনুশকা কুমারী দুর্দান্ত গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া বাংলাদেশ সফলতা পায় ৭১তম মিনিটে। মারিয়াম বিনতে হান্নার গোলে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ।

ফাইনালে বাংলাদেশের নায়ক হয়ে ওঠেন গোলরক্ষক ইয়ারজান বেগম। টাইব্রেকারে ভারতের তিনটি শট ঠেকিয়ে দেন এই গোলরক্ষক। তবে বাংলাদেশের হয়েও গোল করতে পারেননি দলের দুই সেরা খেলোয়াড় সৌরভি আকন্দা প্রীতি এবং আল্পি আক্তার। কিন্তু গোলরক্ষক ইয়ারজানের দৃঢ়তায় শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে ফেরে লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

এই জয়টি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। কারণ মাস খানেক আগে ঢাকায় অনূর্ধ্ব-১৯ ফাইনালে ভারতের সঙ্গে ট্রফি ভাগাভাগি করতে হয়েছিল। সেই ম্যাচটিও পেনাল্টিতে গিয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি দলের ১১টি শটের পরেও বিজয়ী খুঁজে পায়নি। এরপর ট্রফি ভাগাভাগি করা হয় ।

প্রতিবেদন : মো. ফারুক হোসেন

অভিনয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

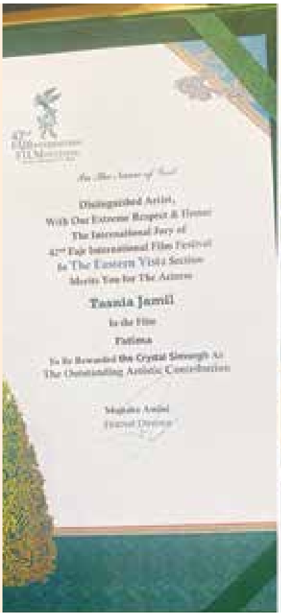

অভিনয়ের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলেন দেশের ছোটো পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। ইরানের ঐতিহ্যবাহী ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি জিতেছেন ক্রিস্টাল সিমোর্গ অ্যাওয়ার্ড। 'ফাতিমা' চলচ্চিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার পেলেন তিনি। পুরস্কার ঘোষণার আগের দিন বিশেষ প্রয়োজনে দেশে চলে আসায় ১১ই ফেব্রুয়ারি অভিনেত্রী ফারিণের পক্ষ থেকে মঞ্চে এ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন সিনেমাটির নির্মাতা ধ্রুব হাসান।

৮ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে উৎসবের ইস্টার্ন ভিস্তা (এশিয়ান-ইসলামিক দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত) বিভাগে প্রদর্শিত হয় ফারিণের 'ফাতিমা' চলচ্চিত্রটি। এ বিভাগে প্রতিযোগিতা করেছে এশিয়ান-ইসলামিক দেশের চলচ্চিত্রগুলো। ধ্রুব হাসান পরিচালিত 'ফাতিমা' সিনেমার গল্পটি আবর্তিত হয়েছে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন নারীর চ্যালেঞ্জকে ঘিরে।

কয়েক বছর ধরে টেলিভিশন নাটকে ব্যস্ত অভিনয় শিল্পী তাসনিয়া ফারিণ। ছোটো পর্দার এই অভিনেত্রী দেশে একাধিক ওয়েব ফিল্মের পাশাপাশি কলকাতার একটি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। তবে ছয় বছর আগে অভিনয় জীবনের শুরুতে তিনি ধ্রুব হাসান পরিচালিত এই 'ফাতিমা' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার গল্পে নির্মিত এই ছবিতে ফারিণের সঙ্গে আরো অভিনয় করেছেন পান্থ কানাই, ইয়াশ রোহান, মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিক আনাম খান, শতাব্দী ওয়াদুদ, শাহেদ আলী প্রমুখ।

এদিকে পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে ফেসবুকে ফারিণ লিখেছেন, 'আমার ফিল্ম *ফাতিমা*-এর জন্য ইস্টার্ন ভিস্তা বিভাগে আমাকে ক্রিস্টাল সিমোর্গ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার জন্য ৪২তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসবকে ধন্যবাদ। নিজের হাতে পুরস্কার পাওয়ার জন্য আরও এক দিন থাকতে পারলাম না, কিন্তু পরিচালক ধ্রুব হাসান ভাইয়া আমার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি নিয়েছেন, এর চেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হয় না। আমার কাজকে ভালোবাসার জন্য জুরিকে ধন্যবাদ এবং তেহরানে আমি যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছি, তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এটি সত্যিই একটি স্বপ্নের মুহূর্ত ছিল।'

উল্লেখ্য, গত ১লা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছিল ৪২তম ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ১১ই ফেব্রুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এটি শেষ হয়েছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

অ্যাপ বানাল শিশু রাইশা

ছয় বছরের রাইশা রহমান তৈরি করেছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' নামের একটি অ্যাপ। ৪ঠা মার্চ সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছে শিশু রাইশার পরিবার। যা ইতিমধ্যে প্লে স্টোরে রয়েছে। সে প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। অ্যাপটি ওপেন করলেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বেজে উঠে।

অ্যাপটিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে জানার মতো কিছু তথ্য। রাইশা শেরপুর শহরের নবীনগর মহল্লার কামরুন্নাহার ও লুৎফর রহমান দম্পত্তির ৫ সন্তানের মধ্যে সবার ছোটো। উত্তরার প্রাইম ব্যাংক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে পড়ে।

রাইশার মা কামরুন্নাহার বলেন, মাত্র এক বছর বয়সে রাইশা কম্পিউটারের যে-কোনো ভার্সনের উইন্ডোজ অপারেটর করতে পারত। বিভিন্ন গেম অনায়াসেই খেলতে পারত। তার প্রত্যাশা রাইশা বড়ো হয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হবে।রাইশা তার অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করার অনুরোধ জানিয়েছে।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

রোমান যুগের ডিম

প্রায় ৪৫০ বছর রোমান শাসনের অধীনে ছিল যুক্তরাজ্য। তখন ব্রিটানিয়া নামে পরিচিত হলেও রোমানরা যুক্তরাজ্যকে আলবিয়ন নামে ডাকত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৩ থেকে ৪১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান শাসনে ছিল ব্রিটেন। যুক্তরাজ্যের বাকিংহামশায়ারে ভবন বানানোর জন্য খনন করার সময় সেই রোমান আমলের একটি গর্ত পাওয়া যায়। সেই গর্তে ১ হাজার ৭০০ বছরের পুরনো হাতে বোনা ঝুড়ি, চামড়ার জুতা আর পশুর হাড়ের সঙ্গে দাগযুক্ত চারটি মুরগির ডিম পাওয়া যায়। ডিমগুলো উদ্ধারের পর পরই কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ক্যান করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিদদের বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেন, উদ্ধার করা ডিমগুলোর মধ্যে একটি অক্ষত মুরগির ডিম। এটি একটি 'সত্যিকারের অনন্য আবিষ্কার হিসেবে প্রশংসিত হয়। যদিও আরও তিনটি ডিম আবিষ্কার হয়েছিল, কিন্তু তা ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়া। ডিমটি মাইক্রো স্ক্যান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, ডিমটি এখনো কুসুম এবং সাদা অংশ ধারণ করে চলেছে। এমনকি ডিমটির মধ্যে তরল পদার্থও রয়েছে, যা কুসুম ও অ্যালবুমিনের মিশ্রণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। অক্ষত ডিম খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে অক্সফোর্ড আর্কিওলজির বিজ্ঞানী অ্যাডওয়ার্ড বিডুলফ বলেন, এটা একটা আশ্চর্যজনক আবিষ্কার। আমরা প্রায়ই ডিমের খোসার টুকরা খুঁজে পাই কিন্তু অক্ষত ডিম পাই না। স্ক্যান করার পর একটি ডিমের মধ্যে কুসুম ও ডিমের সাদা অংশ পাওয়া গেছে। ডিমটিতে কুসুম ও অ্যালবুমিন একসঙ্গে মিশে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো ডিম হতে পারে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর খাবার

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে সেসব শিশুদের বোঝায় সমবয়স্কদের তুলনায় যাদের বুদ্ধি সংবেদন, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ভাব বিনিময় ক্ষমতা ও সামাজিক দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাত্রার কম বা বেশি হয় তাকেই ব্যতিক্রমী শিশু বলে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ যারা সাধারণের বাইরে তারাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু।

এটা স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা। এতে শিশু অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে। এর সুনির্দিষ্ট কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। শিশুর জন্মের তিন বছরের মধ্যে এর প্রকাশ ঘটে। তবে যত দ্রুত এ সমস্যা শনাক্ত করা যায় ততই মঙ্গল। পরিবারের অন্যদের চেয়ে এ শিশুদের খাবারে যদি কিছুটা পরিবর্তন আনা যায় তবে তাদের উপসর্গগুলো থেকে যতটা সম্ভব ভালো রাখা যায়।

এদের খাবার ঠিক করার সময় দেখতে হবে, রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক আছে কি না। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের কোনো ঘাটতি আছে কি না। তাদের খাবার এমন হবে, যাতে থায়রয়েডের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। তাদের খাবার হবে গ্লুটেন ও কেজিন ফ্রি এবং সহজ শর্করামুক্ত।

গ্লুটেন ফ্রি খাবার : গ্লুটেন থাকে আটা, ময়দা, বার্লি, ইস্ট ও ভুট্টার মধ্যে। সুতরাং আটা-ময়দার তৈরি খাবার যেমন-রুটি, বিস্কুট, নুডলস, কেক, সুজি, সেমাই, পাস্তা, পাউরুটি, পিৎজা ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। তাদের দিতে হবে চাল ও ডালের তৈরি খাবার। এ জন্য দিতে হবে-চালের রুটি, ভাত, খিচুড়ি, পিঠা, চালের সেমাই, ধানের খই, মুড়ি, চিড়া, চালের সুজি, পেঁয়াজু। এছাড়া দিতে হবে আলুর তৈরি খাবার। যেমন- ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, আলুভর্তা, আলুর চপ, আলুর দম ইত্যাদি। প্রতি বেলায় তাদের ভাত দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গ্লুটেন হলো-জটিল প্রোটিন। এর অন্য নাম প্রোলামিন। যাদের গ্লুটেন সংবেদনশীলতা থাকে তাদের তলপেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, চুলকানি, মাথাব্যথা হতে পারে।

কেজিন মুক্ত খাবার : কেজিন থাকে দুধের মধ্যে। এটি দুধের প্রধান প্রোটিন। এ কেজিনের জন্যই দুধ জমাট বেঁধে যায়। কেজিন মুক্ত খাবারের জন্য অটিজমের ক্ষেত্রে দুধ বাদ দিতে হয়। এতে শিশুদের মায়েরা বিপাকে পড়েন। কারণ দুধ ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস। এ কারণে দুধ ছাড়া অন্যান্য ক্যালসিয়াম তাদের দিতে হবে। যেমন-সব রকমের ডাল, বাদাম, ছোটমাছ, পোস্তদানা, সমুদ্রের মাছ, শালগম, কালো কচুর শাক, সজনে পাতা, বাঁধাকপি, ব্রকলি, খেজুর, ডুমুর, ধনেপাতা, সীমের বিচি, মটরশুটি।

সহজ শর্করা : শর্করা দুই রকম। জটিল শর্করা ও সহজ শর্করা। জটিল শর্করা হলো-ভাত-রুটি, চিড়া, মুড়ি, খই, আলু ইত্যাদি। সহজ শর্করা হলো-চিনি, মিষ্টি, গুড়, মধু, গ্লুকোজ ইত্যাদি। অটিজমের ক্ষেত্রে যাতে রক্তে শর্করা বেড়ে না যায় সে জন্য সহজ শর্করা বাদ দিতে হবে। এ জন্য চিনি ও গুড়ের তৈরি খাবার যেমন-মিষ্টি, হালুয়া, পুডিং, আইসক্রিম, কোমল পানীয়, মিষ্টি পিঠা বাদ দিতে হবে।

যদি কোনো বাচ্চার হাইপোথায়রডিজম থাকে তাহলে তাদের খাবার থেকে মুলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি ও ব্রকলি বাদ দিতে হবে। এদের খাবারে সামুদ্রিক মাছ ও আয়োডিনযুক্ত খাবার দিলে ভালো হয়।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

কাঠের তৈরি সাইকেল

আমাদের দেশে কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে সাইকেল। চাকা থেকে শুরু করে পুরো কাঠামোই কাঠের তৈরি। বাগেরহাটে তৈরি এই সাইকেল অবশ্য বাংলাদেশের কোনো বাজারে বিক্রি হয় না। সাইকেলগুলো তৈরি হয় শুধুই ইউরোপের বাজারের জন্য। দেখতে খেলনা মনে হলেও দেশের বাইরে এই সাইকেল ব্যবহার হচ্ছে বাহন হিসেবে। বিশেষ ধরনের এ সাইকেল ‘বেবি ব্যালেন্স সাইকেল’ নামে তৈরি হচ্ছে। বাগেরহাটের স্থানীয় ৩০ জন নারী-পুরুষ এ সাইকেল তৈরি করছেন। এদের কেউ চাকা, কেউ সাইকেলের হ্যান্ডেল বা ফ্রেম তৈরি করছেন। এটি রঙ দিয়ে পলিশ করা হয় । ৩০ জন কর্মী মিলে প্রতিদিন তৈরি করেন অন্তত ৩০টি

সাইকেল। দেশের নতুন রপ্তানি পণ্য এই সাইকেল তৈরির উদ্যোক্তা বাগেরহাট বিসিক শিল্প নগরীর ন্যাচারাল ফাইবার নামে একটি প্রতিষ্ঠান। একটি সাইকেল তৈরি করতে ১১টি পার্টের প্রয়োজন হয়, সময় লাগে দেড় থেকে দুইদিন। কারখানার বিভিন্ন স্থানে পার্টগুলো তৈরি করার পর নির্দিষ্ট একটি স্থানে সব পার্ট একত্র করে একটি সাইকেলে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর রং দিয়ে পুরোপুরি তৈরি হয় বেবি ব্যালেন্স সাইকেল। শুধু বাইসাইকেল নয়, কাঠ দিয়ে তারা তৈরি করছেন সান বেড, হোটেল বেড, কুকুর-বিড়ালের খেলনাসহ পরিবেশবান্ধব আরও বেশ কিছু আকর্ষণীয় ফার্নিচার। যার চাহিদা তৈরি হয়েছে বিশ্ববাজারে।

নৃ-গোষ্ঠীর ৬ ভাষায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ এবার চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি- ছয়টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসব প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক হাকিম আরিফ জানান, এ উদ্যোগের ফলে চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি ভাষার শব্দের সংখ্যার সাথে সাথে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাও বেড়ে গেল। সংশ্লিষ্ট ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যেমন মিথস্ক্রিয়া তৈরি হবে, তেমনি বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মানসিক ঐক্যবন্ধনও দৃঢ় হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন মাতৃভাষার মধ্যে সম্প্রীতি তৈরির লক্ষ্যে অনুবাদ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ধারাক্রমের একটি শুভ উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশের ছয়টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী গ্রন্থটি অনুবাদ করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

দৃষ্টিনন্দন বই-দেয়াল

বন্ধুরা, আজ তোমাদের এমন একটি দেয়ালের কথা বলব যেটি বইয়ের মোড়ক দিয়ে সাজানো। মোবাইল গেমস, ফেসবুক এবং ইউটিউবে ডুবে থাকা বর্তমান প্রজন্মকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে বাড়ির দেয়াল সাজিয়েছেন রাকিব হাসান নামের কিশোরগঞ্জের এক বইপ্রেমী। কালজয়ী ৩৩টি বইয়ের মোড়কে তিনি বাড়ির দেয়াল সাজিয়েছেন। প্রতিদিন এই দেয়াল দেখতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছে মানুষ। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার সরারচর ইউনিয়নের কালেরখাঁ ভাগুা গ্রামের বীরমুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত শামছুল হক ভূঁইয়া ও তার স্ত্রী ছিলেন বইপ্রেমী। তাদের ছেলে রাকিব হাসানেরও রয়েছে বাবা-মায়ের মতো বই পড়ার অভ্যাস । তাই তিনি বাড়ির দেয়াল সাজিয়েছেন কালজয়ী বইয়ের নামে। ব্যতিক্রমী এ দেয়াল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে স্টিলের পাত। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি', বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', জসীম উদদীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ', আনিসুল হকের 'মা', সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল', 'হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা ও জননীর গল্প', সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' ইত্যাদি নামকরা বই রয়েছে রাকিব হাসানের বইয়ের দেয়ালে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেসামরিক পুরস্কার, ৫. জ্ঞান-বুদ্ধি, ৮. কুঠার দিয়ে কাঠ কাটা যার পেশা

উপর-নিচ:

১. প্রকৃতিগত, ২. যে দেশে শস্যের উৎপাদন নদীর জলের উপর নির্ভরশীল, ৩.ফুলের বাগান, ৪.অনিমন্ত্রিত অতিথি, ৫.আসমান,৬. লতা, ৭.সাগর, ৯.শূন্য

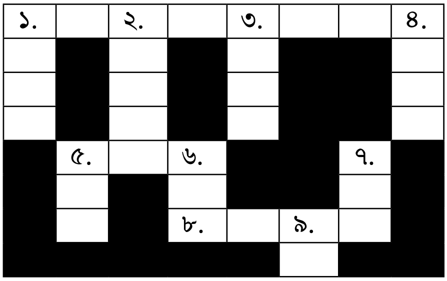

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: সিয়েরা লিওন, অথবা, গায়েব, লিলিপুট, রস, সপুষ্পক, হাস, গুণবাচক, কর, সরস, রদ

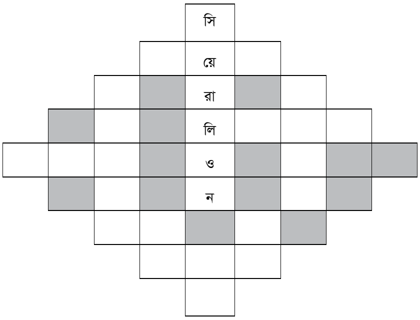

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

১৯		২১		৩১			৫৪	
	২৩		২৯		৫১	৫৮		৫৬
	২৪	২৭			৫০	৫৯	৬০	
	২৫		৩৫	৩৪			৬৩	৬২
১৫		১৩		৪৫		৪৭		৮১
	৩		৩৭		৬৭		৬৫	
১		১১		৪৩		৭৩		৭৯
	৫		৩৯		৬৯		৭৫	
৭		৯		৪১		৭১		

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৯	+		-	৫	=	
/	■	+	■	+	■	-
	*	২	-		=	৫
+	■	+	■	-	■	+
২	+		+	২	=	
=	■	=	■	=	■	
	+	৬	-		=	৭

ফেব্রুয়ারি মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

উ	প	জে	লা			শ	র্তে
প		র				র	
গ্র		বা	লা	মু	সি	ব	ত
হ		র		খো		ত	
	ছা		কে	শ	র		
	য়া						
	মূ	ল্যা	য়	ন			গ্রা
	র্তি			য়		স	ম

ছক মিলাও

				অ				
				স				
				মা				
				পি				
				কা				
				ক্রি				
				য়া				

ব্রেইন ইকুয়েশন

৮	*	২	-	৭	=	৯
/		*		-		+
৪	/	১	+	২	=	৬
+		+		/		-
১	*	৩	-	১	=	২
=		=		=		=
৩	+	৫	+	৫	=	১৩

নাম্ব্রিক্স

২১	২২	২৩	৩০	৩১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫
২০	২৫	২৪	২৯	৩২	৪১	৫২	৫১	৪৬
১৯	২৬	২৭	২৮	৩৩	৪০	৫৩	৫০	৪৭
১৮	১৭	১৬	৩৫	৩৪	৩৯	৫৪	৪৯	৪৮
১১	১২	১৫	৩৬	৩৭	৩৮	৫৫	৫৬	৫৭
১০	১৩	১৪	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৫৯	৫৮
৯	৮	৭	৭২	৮১	৭৮	৭৭	৬০	৬১
২	৩	৬	৭১	৮০	৭৯	৬৬	৬৫	৬২
১	৪	৫	৭০	৬৯	৬৮	৬৭	৬৪	৬৩

ইসরাক হাসান আদৃক, অষ্টম শ্রেণি, মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

আফনান সাদ জামান, সপ্তম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

তাছনিম আক্তার শিফা, সপ্তম শ্রেণি, কাজকামতা আলিম মাদ্রাসা, বরুড়া, কুমিল্লা

সামিকা নূর ইমি, কেজি শ্রেণি, চারুপাঠ হাতেখড়ি স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

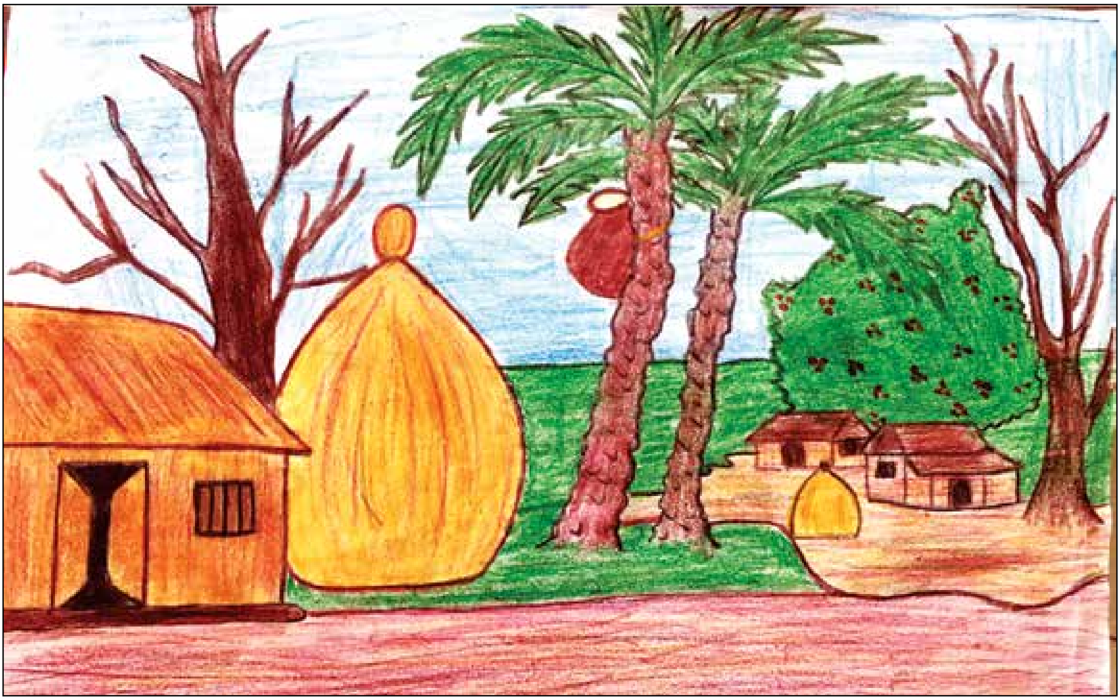

ফারিন খান, অষ্টম শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মারিয়াম হোসাইন, রইছ উদ্দিন একাডেমী, নকলা, শেরপুর

রহমাতুল আলম, তৃতীয় শ্রেণি, শেরেবাংলা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আরিকা আজিজ, তৃতীয় শ্রেণি, সেন্টার গর্ভমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

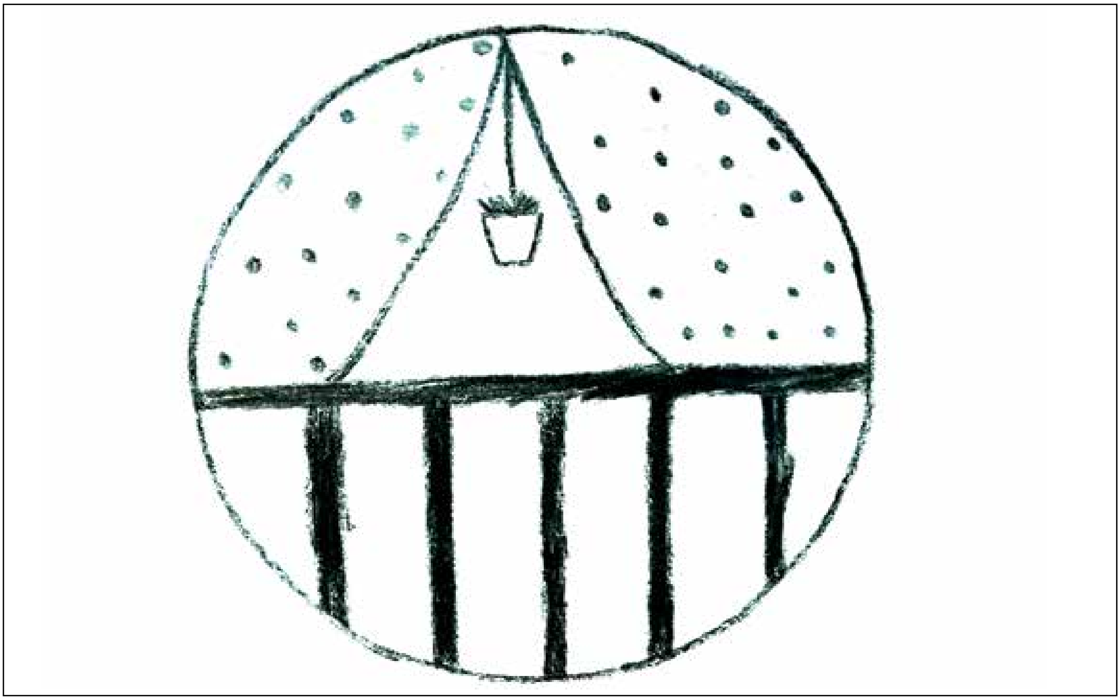

কায়নাত মারিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, চাঁদপুর

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-09. March 2024, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা